সানন্দা

৩০ অগস্ট ২০২২

রান্নাঘর
পুজোর মরসুমে রংবাহারি রেসিপি

মুখোমুখি
অলকা ইয়াগনিক

অসাধারণ
শ্রীজা আকুলা

ফ্যাশন
হাতে বোনা শাড়ি: ডিজাইনার সৌমিত্র মণ্ডল



সানন্দা প্রচ্ছদকাহিনি

শাড়িকাহনে পশ্চিমবঙ্গ

এই বঙ্গের সম্পদ বিভিন্ন ফ্যাব্রিক, প্রিন্ট এবং বুননের শাড়ি। বাঙালির সাজে এই বাংলা কতখানি জুড়ে আছে? শাড়িকে কেন্দ্র করে কীভাবেই বা হয়ে উঠবেন সফল অন্ত্রপ্রনর? জানাচ্ছে সানন্দা। সঙ্গে বিভিন্ন হোমগ্রোন ব্র্যান্ডের এক্সক্লুসিভ কালেকশন।

সূচিপত্র

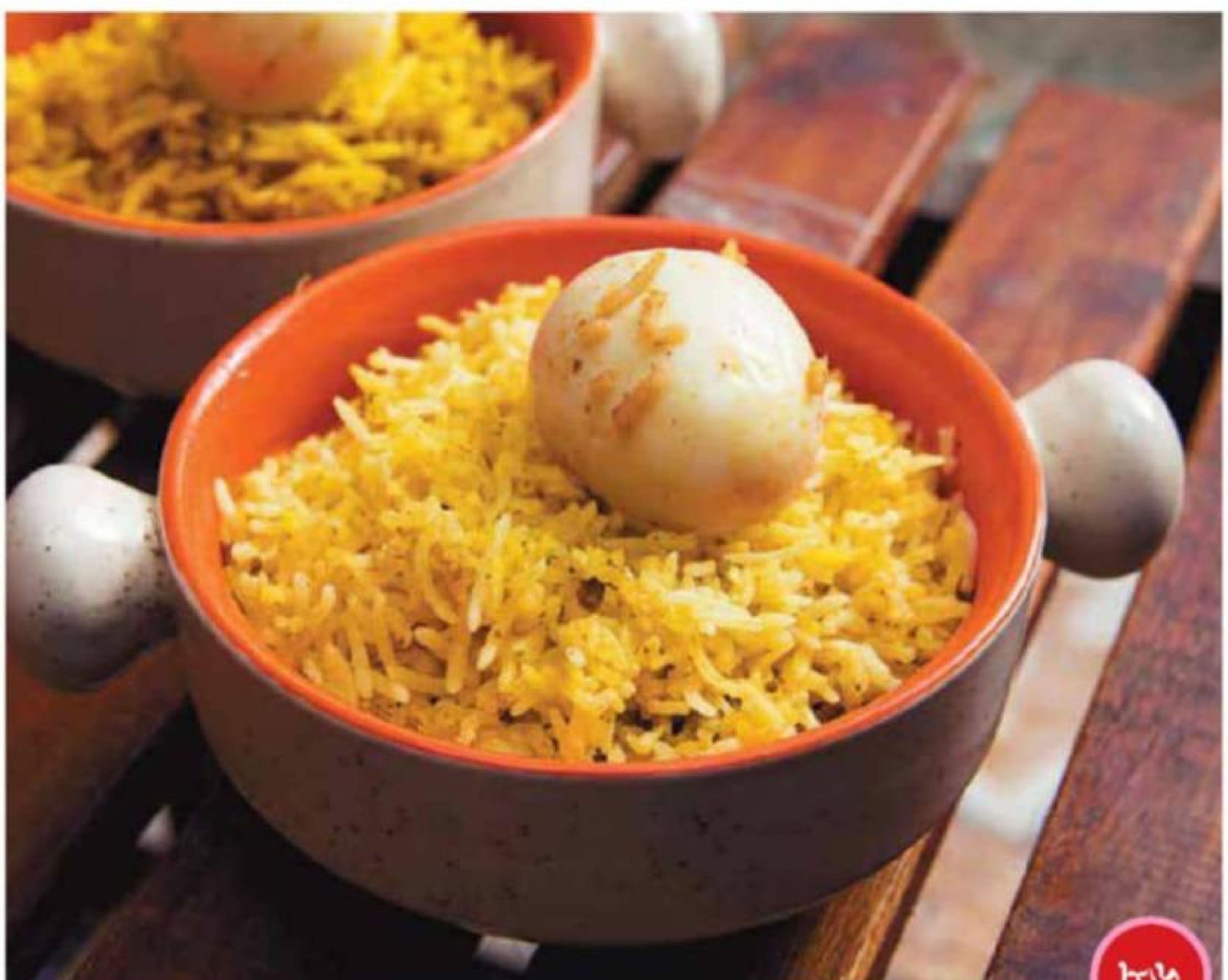
৩৭ বর্ষ ২ সংখ্যা। ৩০ অগস্ট ২০২২। ১৩ ভাদ্র ১৪২৯



প্রচ্ছদকাহিনি ১

বৈচিত্রে বিশিষ্ট বঙ্গ

১৯৭৪ সালের ১৫ অগস্ট তাঁতে বোনা শাড়ির ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য কলকাতায় আসে 'আনন্দ'। কীভাবে তৈরি হয় ধনিয়াখালি, বালুচরি, বিষ্ণুপুরি সিল্ক। সে বিষয়ে আলোচনা রইল সানন্দার পাতায়।



রান্নাঘর

যত রং, তত গুণ!

নানা রঙের খাবারের মধ্যে রয়েছে হাজারও পুষ্টির উপাদান। লাল, হলুদ, সবুজ... প্লেটে তাই যত সংখ্যক রং রাখা যায়, স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ততই ভাল। সেইরকমই কিছু সুস্বাদু রঙিন রেসিপির সন্ধান রইল 'সানন্দা'-র পাতায়।

প্রচ্ছদ মডেল: রিয়া বণিক
মেক-আপ: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১১২৩৩৬১৮
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
লোকেশন: হায়াত রিজেন্সি হোটেল, কলকাতা
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০১২৩৪
ছবি: শুভজ্যোতি রায়চৌধুরী

শাড়ি: আনন্দ
কুইন্স ম্যানসন,
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা- ৭০০০৭১
ফোন: ২২২৯২২৭৫
৯৬৭৪৩৯২২৭৫

সম্পাদক: পায়েল সেনগুপ্ত

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১ থেকে মুদ্রিত।

RNI NO. 44046/86

30th August 2022, 37 years 2 Issue.



ব্যাক্তি-স্বাধীনতা ও নারী

সানন্দা-র ১৫ অগস্ট সংখ্যাটি বেশ অন্যরকম। স্বাধীনতা দিবসের ৭৫ বছরে নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে 'সানন্দা'-র এবারের সংখ্যাটি খুবই ভাল লাগল। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মেয়েদের অগ্রগতির যে ইতিহাস উঠে এসেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীদের এগিয়ে চলার গল্প মুগ্ধ করেছে। বিবাহিত জীবন হোক বা পেশাজগৎ, সব জায়গায় মেয়েদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর থাকা খুব প্রয়োজনীয়। নিজের অধিকার নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। তথ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন লেখাগুলিতে, ব্যক্তিত্বময়ী বিভিন্ন নারীদের কাহিনি সেই কথাই নতুন করে জানায়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে নারী সংগ্রামের নানা পথকে চেনানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ 'সানন্দা'কে।

দেবত্রয়ী সান্যাল, বরানগর

ইমেল মারফত

উজ্জ্বল নারীদের গল্প

'সানন্দা' পত্রিকা প্রতি সংখ্যায় অনেক নতুন ও অফবিট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ১৫ অগস্টের 'সানন্দা' সংখ্যায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল নানা নারীব্যাক্তিত্বদের জীবনের গল্প সত্যিই অনুপ্রাণিত করার মতো। ফিল্মমেকার, অধ্যাপক, পর্বতারোহী, পরিবেশবিদ, পাইলট, বৈজ্ঞানিক কিংবা ভারতের প্রথম ট্রান্স বিউটি কুইন— নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা। চলার পথে নানা বাধা-বিপত্তি-সমস্যা আসবেই। সেগুলো পেরিয়েই এগিয়ে যেতে হবে নির্দিষ্ট লক্ষের দিকে। মোট কথা হল, থামলে চলবে না। সেই বিষয়টিই সাক্ষাৎকারগুলিতে সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের মতো গৃহিণী বা ওয়ার্কিং ওম্যানদেরও রোজকার জীবন ও কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করেই চলতে হয়। সেইদিক থেকে 'সানন্দা'-র এই আর্টিকেলটি খুবই ভাল লাগল।

ঈশিতা চক্রবর্তী, গড়িয়া

ইমেল মারফত

গত ১৫ অগস্ট ২০২২ সংখ্যায়, অসাধারণ ৫ (৮৪ এবং ৮৫ নম্বর পাতা) পাইলট আইনা রায়চৌধুরীর নামটি ভুলবশত ইনা রায়চৌধুরী-র নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

সম্পাদকীয় বিভাগ

গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণ

সানন্দা-য় গল্প এবং উপন্যাস মনোনয়নের জন্য পাঠাতে চাইলে হাতে লিখে কিংবা প্রিন্টআউট করে আমাদের দফতরে পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠানো গল্প সানন্দা-র প্রিন্ট সংস্করণের জন্য গ্রাহ্য করা হবে না। অবশ্যই নিজের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর যেন লেখা থাকে। গল্প বা উপন্যাস মনোনীত হলে আমরা ওয়ার্ড ফাইলটি চেয়ে নেব। গল্পের শব্দসংখ্যা ২৫০০ থেকে ৩০০০।

ঠিকানা:
সানন্দা গল্প বিভাগ,
এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১

যাঁরা সানন্দা-র ওয়েবসাইটের জন্য গল্প পাঠাবেন, তাঁরা ১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প মেল করবেন, হার্ড কপি পাঠাবেন না। মেল-এর সাবজেক্টে অবশ্যই লিখবেন 'সানন্দা ওয়েব গল্প'। ভ্রমণকাহিনির ক্ষেত্রে ইউনিকোডে টাইপ করে আমাদের ইমেল করতে হবে। ছবি ভাল রেজ়লিউশনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে হাতে লিখে পাঠানো ভ্রমণকাহিনি গ্রাহ্য হবে না। প্রিন্টেড ছবি পাঠাবেন না। ডিজিটাল ছবি পাঠাতে হবে। অন্য বিভাগে লেখা পাঠাতে হলে মেল-এ সাবজেক্ট অবশ্যই উল্লেখ করে দেবেন।

মেল আইডি:
sananda@abp.in

সু দো কু

১৪৮

৭	৬			৮	১	৪		
				৩			৭	৬
৩	৪							৯
	২				৯	৭		৫
			৭	৬	২			
৬		৯	৮				৪	
২							৮	৭
১	৩			৯				
		৬	২	৭			৯	১

উপরের ছকগুলিতে মোট ৯টি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলিতে হিসেব করে বাকি সংখ্যাগুলো বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে উপরে-নীচে বা পাশাপাশি লাইনে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা দু'বার না বসে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

১৫ অগস্ট সংখ্যার সমাধান

২	৫	৮	৩	৪	১	৯	৭	৬
৭	৯	৩	৬	২	৮	৫	১	৪
৪	১	৬	৯	৭	৫	৮	২	৩
৮	৬	৯	৪	১	৩	২	৫	৭
৩	৪	১	৭	৫	২	৬	৮	৯
৫	৭	২	৮	৯	৬	৪	৩	১
৬	২	৪	৫	৩	৭	১	৯	৮
৯	৩	৫	১	৮	৪	৭	৬	২
১	৮	৭	২	৬	৯	৩	৪	৫

বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট বঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গীয় শাড়ির বৈশিষ্ট্য কী? প্রতিযোগিতার বাজারে কীভাবে তা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে জানালেন বিশেষজ্ঞ চম্পাবতী সরকার।



'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন...' এই বিবিধ রতনের মধ্যে অবশ্যই পড়ে শাড়ি। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেলে দুই বাংলার শাড়িই নতুনভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু বাঙালির চিরন্তন শাড়ি-সজ্জায় ঠিক কতখানি জুড়ে রয়েছে এই বাংলা, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ? 'আনন্দ'-র কর্ণধার চম্পাবতী সরকারের মতে, ''সহজে পরিধানযোগ্য, নন-ক্রাশ, ইজ়ি ড্রেপ শাড়ির রমরমার এই যুগে অন্যান্য রাজ্যের সিল্ক, শিফন, ক্রেপের সঙ্গে বাংলার শাড়িকে যথেষ্টই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে। পুজোর সময়টা বাদ দিলে আজকের নবীন প্রজন্ম তাঁতের শাড়ির চেয়ে শিফনকেই অগ্রাধিকার দিলে কী হবে, বাংলার শাড়ির প্রিন্ট আজও তুমুল জনপ্রিয় এবং কারিগরি দক্ষতা ও ডিজ়াইনিংয়ের শ্রেষ্ঠত্বের টানে সারা দেশের বহু শাড়িবিক্রেতা কিন্তু আজও শাড়ি প্রিন্ট করতে দেন এই বাংলাতেই। বাংলার বালুচরি সিল্ক আজও তার গায়ে বোনা জন্তুজানোয়ার ও অন্যান্য জিনিসের ছবি এবং কোমলতার জন্য জনপ্রিয়। তা ছাড়া বেনারসি বালুচরির চেয়ে বাংলার বালুচরির দামও কম।

১৯৭৪ সালের ১৫ অগস্ট কলকাতার নাগরিকদের স্বাগত জানিয়েছিল 'আনন্দ'। ডিজ়াইনে অভিনবত্ব, রঙে নতুনত্ব আর সর্বোপরি গুণমানের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হয়ে বাংলার তাঁতেবোনা শাড়ির ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল আমাদের বুটিকের প্রাথমিক লক্ষ্য। বাংলার শাড়ির প্রাণকেন্দ্র ফুলিয়া এবং ধনিয়াখালির শ্রেষ্ঠ তাঁতিরা নতুন কাপড়ে ফুটিয়ে তুললেন পুরনো স্টাইল। তাঁদের নতুন সুতো জোগান দিয়ে তৈরি করা হল 'আনন্দ টাঙ্গাইল'— প্লেন জমিতে চওড়া 'নকশা বর্ডার'-এর সফ্‌ট নরম সুতির 'তাঁতের শাড়ি'। ধনিয়াখালির শাড়ি তুলনায় মোটা, অথচ আকর্ষণ ও স্বাচ্ছন্দ্যে তারও জুড়ি মেলা ভার। আমরা আটের দশকের অত্যন্ত জনপ্রিয় জ্যামিতিক এবং ঢাকাই স্টাইল ফুল-ফুল নকশার বাংলার সিল্ক টাঙ্গাইলকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম, যা ছিল মোটিফ বা ডিজ়াইনে আনকোরা, গরমে আরামদায়ক, সবচেয়ে খাঁটি সুতির শাড়ি।''

এই পথ চলা অফুরান। পুজোর মরসুমে বর্ণে-গন্ধে বাঙালি আরও বেশি করে বাংলাকে অঙ্গে জড়িয়ে রাখুক, সম্মান দিক এখানকার শিল্প ও শিল্পীকে।

শাড়ি: আনন্দ, কুইন্‌স ম্যানসন, ১৩ রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭১, **ফোন:** ২২২৯২২৭৫, ৯৬৭৪৩৯২২৭৫, **মডেল:** জুহি, **মেক-আপ:** বাবুসোনা সাহা, **ছবি:** সোমনাথ রায়

এই বাংলার শাড়ি

বাংলার সিল্কের ইতিকথা

হ্যান্ডলুমের পসরায় বনেদিয়ানা ও আভিজাত্যে পরিপূর্ণ মুর্শিদাবাদ সিল্কের অন্তর্গত বালুচরি, গরদ, কোরিয়াল শাড়ি। সেই শাড়ির বুনন কেমন ছিল? সেই শাড়ির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতই বা কী? শাড়ির সাতকাহন লিখলেন দেবলীনা অধিকারী।





কালো রংয়ের বালুচরি শাড়ি। জমি ও আঁচল জুড়ে সিলভার ও গোলাপি সুতোর কাজে বনেদি লুক।



সিল্কের বুনন

কবি সুবোধ সরকারের 'শাড়ি' কবিতায় মেয়েটা শাড়ি পেয়েছিল একান্নটা। এই শাড়ি কেবল বারো হাতের কাপড় ছিল না। শাড়ি আসলে কী? একটা নীল রং-এর মুক্ত আকাশ, টকটকে লাল রঙের গোলাপ, রেড-ওয়াইনের আয়েসি চুমুক। শাড়ির কুঁচিতে, আঁচলে গোছানো থাকে অর্ধেক আকাশের সংসার। এই শাড়ির পাড় ও আঁচল নির্মিত হয় তাঁতিদের প্রতিভা, ঘাম ও অশ্রুর বুননে। শাড়ির ঐতিহ্য খুঁজতে গিয়ে গবেষকরা পৌঁছে গেছেন ইন্দাস ভ্যালিতে এবং হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার কাছে, ২৬০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকে এক পুরুষের মূর্তি পাওয়া যায়, যার ডান কাঁধে শালের মতো কোনও একটা বস্ত্র আছে। প্রাচীন ভারতের চিত্র থেকে দেখা যায় মহিলারা একটি সেলাইহীন বস্ত্রকে লম্বাভাবে পরিধান করত এবং কোমরের কাছে কোনও অলংকার দিয়ে সেটি পরস্পর যুক্ত করে নিত। এই শাড়ি শব্দটি এসেছে দক্ষিণী শব্দ chati অথবা Shati থেকে। প্রাচীন নানা পুরাণ থেকে জানা যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে বস্ত্র পরা হত তাকে বলা হত 'পরিধানা' বা 'বস্ত্র'। তাতে যে তন্তু ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হত 'সুকমা বস্ত্র' বা 'সু-বস্ত্র'। মূলত কাছার মতো করে এই বস্ত্র পরা হত। সোনালি এবং রুপোলি সুতো দিয়ে এর পাড় অলঙ্কৃত করা থাকত। তসর, এরি, মুগা সিল্ক দিয়ে এই বস্ত্র তৈরি হত। প্রাকৃতিক সাদা রঙের জন্য এই ধরনের কাপড়কে 'পট্ট-বস্ত্র' বা 'শুভ্র-বস্ত্র' বলা হয়। পরবর্তীতে এইগুলোই রূপান্তরিত হয়ে আজকের সিল্কের শাড়িতে পরিণত হয়েছে। মহাভারতে মুক্তোর পাড়ের 'মিঞ্চিরি' নামক এক শাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্র'তে বাংলার শাড়ির উল্লেখ আছে। প্রাচীন গ্রিক ও ইজিপ্টে বাংলার শাড়ি রপ্তানি হত। গুপ্তযুগে এই শাড়ির শিল্পের মান ও তাঁতিদের যোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আজকের বাংলার সিল্কশাড়ি ধারন করে আছে হাজার বছরের ভারতের সাংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির ঐতিহ্যকে।

বালুচরি শাড়ির পুরাকথন

এই শাড়ি তৈরি হয় মুর্শিদাবাদ সিল্কের উপর। একদা নবাব বাড়ির বেগমদের জন্য তৈরি বালুচরি আজও বাংলার অভিজাত ও বিলাসি শাড়ি



ট্র্যাডিশনাল আঁচলের নকশা

হিসেবে পরিচিত। এই শাড়ির সঙ্গে বর্তমানে বিষ্ণুপুরের যোগ থাকলেও এর আতুঁড়ঘর মুর্শিদাবাদ। সালটা ১৭০৪। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এলেন মুখসুদাবাদে। নবাবের সম্মানে যার নাম হল মুর্শিদাবাদ। বেনারস থেকে একদল তাঁতি গঙ্গাতীরের কাছের গ্রাম বালুচরের কাছে এসে বাসা বাঁধলেন। তখন বাংলার বিখ্যাত শাড়ি বলতে ছিল ঢাকাই মসলিন ও জামদানি। নবাবের আদেশ এল বালুচরের তাঁতিদের কাছে


আঁচলের অলঙ্করণ


আঁচলে পুরাণকথা

> এই শাড়ির সঙ্গে বর্তমানে বিষ্ণুপুরের যোগ থাকলেও এর আঁতুড়ঘর মুর্শিদাবাদ। নবাবের আদেশ এল বালুচরের তাঁতিদের কাছে বছরে অন্তত তিন থেকে চারটে নতুন রকমের শাড়ি তৈরির। **জন্ম হল বাংলার নতুন শাড়ি বালুচরি**

অন্দরমহলের বেগমসাহেবাদের জন্য বছরে অন্তত তিন থেকে চারটে নতুন রকমের শাড়ি তৈরির। তাঁরা এক নতুন শাড়ির সৃষ্টি করলেন, নিয়ে গেলেন নবাবের দরবারে। শাড়ি দেখে মহা খুশি নবাব ও অন্দরমহলের বেগমসাহেবারা। জন্ম নিল বাংলার এক নতুন শাড়ি— বালুচরি। এই বালুচরি শাড়ি কিভাবে বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছল, তার সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রয়াত গবেষক মানিকলাল সিংহের বক্তব্য ছিল যে, বালুচর গ্রাম বন্যায় ডুবে যাওয়ার পরই শিল্পীরা চলে এসেছিলেন বিষ্ণুপুরে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও অত্যাচারিত হওয়াও সম্ভবত এই তাঁতিদের মুর্শিদাবাদ ছাড়ার অন্যতম কারণ। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁতিদের অসাধারণ শৈল্পিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। উপহাররূপে তিনি শিল্পীদের প্রদান করেছিলেন বসত জমি, চাষের জমি, পুকুর। শিল্প সম্মানিত হলেও শিল্পীদের উপর অত্যাচার হয়েছিল নবাবি আমলেও। শোনা যায় কোনও তাঁতি যেন দ্বিতীয়বার একই বালুচরি শাড়ি নির্মাণ না করতে পারে সেইজন্য তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়ার নির্দেশ দেন স্বয়ং নবাব। বিশেষত নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনের পরবর্তীকালে তাঁতিদের উপর এই অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ এই দুইয়ের যুগলবন্দিতেই ঘর ছাড়ে বালুচরের তাঁতিরা। এরপর বিষ্ণুপুরে নতুন করে বালুচরি শাড়ির বুননকার্য শুরু হয় অক্ষয় পাটরাঙার হাত ধরে। এই শুরুর গল্পটিও ছিল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তিনি গিয়েছিলেন বাঁকুড়ার সোনামুখির মনোহর ঠাকুরের মেলায়। সেখানে এক যুবতীর পরনে চিত্রবিচিত্র নকশাদার শাড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে পাটরাঙা পুনরাবিষ্কার করেন হারিয়ে যাওয়া বালুচরি শাড়িকে। নিজ হাতে তৈরি করেন বালুচরি শাড়ি। যদিও এই শাড়ির শিল্পগুণ মুর্শিদাবাদের বালুচরের স্তরে উন্নত হয়নি, খামতি ছিল শাড়ির বর্ণ ও অলঙ্করণে। তবে এই শাড়ির মান ও শিল্পগুণকে চরম উৎকর্ষতার ও পরিচিতির জায়গায় নিয়ে গেলেন গুরুদাস লক্ষ্মণ। তিনি বলেছিলেন যে তিনিই প্রথম বালুচরি শাড়িতে কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বিষয় ছিল রামায়ণ অবলম্বনে রাম-সীতা আর লক্ষণের বনবাস পর্ব। এছাড়াও কৃষ্ণলীলা, শকুন্তলা, টেরাকোটা মন্দির, নবাব ও নর্তকী, আদিবাসী-সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই বুনন বৈচিত্র্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি রাজ্যসরকারের কাছ থেকে বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এভাবেই নবাবের আদেশে সৃষ্টি এই শাড়ি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নবাবি অত্যাচার সহ্য করে,অবস্থান বদলে, শিল্পীর হাত ঘুরে টিকে রইল শিল্পের দাবিতে, আভিজাত্যের উৎকর্ষতায়।


বালুচরির আঁচল

প্রতিভার বুননে বালুচরির অলঙ্করণ

কোনও সৃজনশীল নির্মাণকাজ শিল্প হয়ে ওঠে তার প্রকাশভঙ্গির

উৎকর্ষতায়। বালুচরি শাড়িও শিল্প হয়ে উঠেছে শাড়ির উজ্জ্বল বর্ণে, আঁচলের অলঙ্করণে। এই শাড়ির জন্য ব্যবহৃত হয় উৎকৃষ্টমানের মুর্শিদাবাদ সিল্ক। এই সিল্কের উৎপাদন প্রক্রিয়া অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ, যার জন্য মালবেরি নামক এক উন্নতমানের রেশমপোকার চাষ করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা থাকে 'সেরিকালচার'। চাষ করা রেশমের গুটি থেকে উন্নতমানের রেশমের তন্তু নিষ্কাশিত করা হয়ে থাকে। এরপরের ধাপ রেশমের তন্তুকে মসৃণ ও উজ্জ্বল বর্ণের করে তোলা। যার জন্য এদেরকে গরমজল ও সোডার মিশ্রণে ফোটাতে হয় এবং উজ্জ্বল রং প্রদানের জন্য অ্যাসিডকে প্রাথমিক ভাবে রঙিন পদার্থরূপে ব্যবহার করা হয়। নির্মিত এই তন্তুকে বুননের উপযোগী মজবুত ও দৃঢ় করে তুলতে সুতোর দু প্রান্ত ধরে টানটান করা করা হয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় বালুচরির জন্য উপযোগী বাংলার বিখ্যাত মুর্শিদাবাদ সিল্ক।

প্রাচীনকালে লম্বায় বালুচরি ছিল সাধারণত একটু কম, আটত্রিশ ইঞ্চির। নবাবের বেগমেরা তাঁদের গোড়ালি ও পায়ের পাতাকে অলঙ্কৃত করত রুপোর ও মতির হরেক রকম গয়নার সাহায্যে। সম্ভবত গয়নায় সজ্জিত পায়ের পাতা যাতে শাড়ির পাড়ে ঢাকা না পড়ে তার জন্যই চালু ছিল এই ব্যবস্থা। এই শাড়ি বিখ্যাত হয়েছে তার উজ্জ্বল বর্ণের মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে এই শাড়ির বর্ণ ছিল গাঢ় মেরুন, পার্পল, খয়েরি ও লাল রঙের। যদিও বর্তমানে ক্রেতাদের প্রয়োজন অনুসারে বালুচরিতে এসেছে নানা রঙের সম্ভার। তবে এই শাড়ির কারিগররা শিল্পীর স্তরে উন্নীত হয়েছে তাঁদের অলঙ্করণের অভিনবত্বের দ্বারা। এই শাড়ির জমিতে থাকে ছোট-ছোট বুটি, আর প্রান্তভাগে থাকে ফ্লোরাল নকশা। তবে এই শাড়ির বিশেষত্ব জড়িয়ে আছে তার আঁচলের অলঙ্করণকে ঘিরে। শিল্পীরা সুতোর বুননে শাড়ির আঁচলে ফুটিয়ে তোলে গাথা, পুরাণকাহিনি, রামায়ণ-মহাভারত। নীল, লাল, সবুজ সুতোর টানে সৃষ্টি হওয়া এই শিল্পের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মল্ল রাজার অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা ভাস্কর্যের সঙ্গে। পরবর্তীকালে যুগের পরিবর্তনে গাথা ও পুরাণের সঙ্গে শাড়ির আঁচলে ফুটে উঠেছে আধুনিক জীবনভঙ্গি। অভিজাত ঘরের নর-নারীর ছবি, ধূমপান করা সাহেব ও মেমের ছবিও স্বচ্ছন্দে স্থান পেয়েছে শাড়ির অলঙ্করণে। যদিও আজকের যুগে বালুচরির আঁচলে রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্যপট নতুন করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রথমে বড় কাগজে গ্রাফের সাহায্যে নির্মিত হত হাতে তৈরি নকশা। এরপর এই নকশা পাঞ্চিং পদ্ধতিতে ঠুকে ঠুকে বসানো হত শাড়ির আঁচলে জুড়ে। রুপোর বুনোটও ব্যবহার করা হত অলংকরণে। মিনাকারি পদ্ধতি ব্যবহৃত হত অলংকরণে। বালুচরি সাধারণত দুই রং-এর হলেও মিনাকারির ক্ষেত্রে আরও এক উজ্জ্বল সুতোর ব্যবহার হত। সোনালি সুতোয় যে বালুচরিতে অলংকরণ করা হয় তাকে স্বর্ণচরি বলা হয়। শিল্পীর অসাধারণ প্রতিভাক্ষম, তার সৃষ্টির নেশা এই শিল্পকে দিয়েছে টেরাকোটা শিল্পের গৌরব, হয়ে উঠেছে বাংলার নিজস্ব অহংকার।

লাল সাদা সুতোর বুনোটে বাংলার পুজোর শাড়ি

বাংলায় পুজো ও নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে গরদ শাড়ি। প্রাচীন ভারতে যখন শাস্ত্র পাঠ অথবা মন্ত্রোচ্চারণ হত তখন 'পট্ট-বস্ত্র' বা 'শুভ্র -বস্ত্র' পরিধান করা হত। সেলাই না করা সাদা রঙের বস্ত্রকে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে পবিত্ররূপে মনে করা হত, যে ধারা আজও সমান ভাবে বহমান। পুজো ও বাংলার গরদ শাড়ি প্রায় সমার্থক শব্দে পরিণত। 'গরদ' শব্দটির অর্থও সাদা। পুজোর পবিত্রতা রক্ষা করতে উচ্চমানের সিল্কের বুনোট ব্যবহৃত হয় এই শাড়িতে। গরদ শাড়ি মুর্শিদাবাদি সিল্কেরই একটি ভাগ হওয়ায় পূর্বে উল্লিখিত একই পদ্ধতিতে রেশমগুটি থেকে



নীলের উপরে গোল্ডেন ও ম্যাজেন্টা সুতোর কাজ করা বালুচরি শাড়ি


হাতে আঁকা বালুচরির মোটিফ


বাংলার গরদের পাড়


'সেরিকালচার' পদ্ধতিতে রেশম নিষ্কাশিত করে বুননের জন্য যোগ্য সুতো নির্মিত হয়। কেবল রেশমের প্রাকৃতিক রং বজায় রাখার জন্য বালুচরির মতো অ্যাসিড বা অন্য কোনও রঞ্জক পদার্থকে ব্যবহার করা হয় না। জমিতে শুভ্র বর্ণ ও পাড়ে উজ্জ্বল লাল রং এই শাড়ির সিগনেচার। যদিও শাড়ির এই ধরন কোরিয়াল শাড়িরও বৈশিষ্ট্য। গরদ ও কোরিয়াল শাড়ি পৃথক হয়ে যায় তাদের অলঙ্করণের মাধ্যমে। গরদ শাড়ির পাড়ে উজ্জ্বল লাল রঙের মধ্যে থাকে আম্রমুকুল, ফুল অথবা শঙ্খের মোটিফ অথবা বর্তমানে কাঁথাস্টিচের নকশা। কিন্তু কোরিয়াল শাড়িতে এই ধরনের মোটিফ দেখা যায় না। এই শাড়ি সিল্কের লাল পাড় সাদা শাড়ি রূপেই অধিক পরিচিত। দুর্গা পুজোয় সিঁদুর খেলায় মেয়েদের পরনে যে সিল্কের লাল পাড় সাদা শাড়ি থাকে তা এই কোরিয়াল শাড়ি। এভাবেই প্রতি শরৎকালে পেঁজা মেঘ, ঢাকের বাদ্যি, কাশ ফুলের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের লাল সাদা সুতোর বুনোট।

বিপন্ন শাড়ি নাকি বিলাসি শাড়ি

এই শিল্পের অতীত ছিল আভিজাত্যপূর্ণ ও শিল্পসমৃদ্ধ। এর বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রবণতাও কি একই পথে চলেছে? এর উত্তর বেশ খানিক হতাশা-ব্যঞ্জক। এর কারণ রয়ে গিয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভের দশকে। ইংরেজরা বাংলায় এল মসলিন সুতোর খোঁজে, আর বাংলার আকাশে দিয়ে গেল বস্ত্র শিল্প ধ্বংসের অশনি-সংকেত। যা আরও বেশি তরান্বিত হয়েছে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠার পর। ততদিনে পশ্চিমে ঘটে গিয়েছে শিল্প বিপ্লব। বাজার দখল করতে তারা মেশিনে তৈরি কমদামি বস্ত্রতে ছেয়ে ফেলল বাংলার বাজার, সুতোর উপর বসল মাত্রাতিরিক্ত খাজনা। সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে পা দিল বাংলার শাড়ি শিল্প। এই ঘটনার অসাধারণ সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' ছোটগল্পে। যেখানে তাঁতিপাড়ায় নেমে এসেছে দুপুরের নিস্তব্ধতা। বন্ধ তাঁতের ঠকঠকানি, সাতপুরুষের শিল্পের আভিজাত্য। সুতোর অভাবে গামছা বুনতে বাধ্য হয়েছে তাঁতিরা। গ্রামের জমিদার বাড়ির মেয়ে বউরাও মুখ ফিরেয়েছিল বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে, আপন করে নিয়েছিল মিলের তৈরি বিদেশি শাড়ি। স্বাধীনতার পর সরকার খানিক চেষ্টা করেছিল অবস্থার উন্নতিতে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় হ্যান্ডলুম শিল্পের উন্নতিকল্পে আহমেদাবাদে নির্মিত হয় 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন অফ ডিজ়াইন।' ২০০১-এর ১৪ ই এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরের তরফ থেকে বালুচরির শাড়ির নকশায় বৈচিত্র্য তুলে ধরার জন্য 'ডিজ়াইন সফ্টওয়্যার'এর ব্যবহার করা হয়েছিল। যার প্রয়োগ শেখানোর জন্য তাঁতিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন অফ ফ্যাশন টেকনোলজি'তে। তারপর ঠিক কেমন হল এই শিল্পের ও শিল্পীর অবস্থা? তা বোঝা যায় এঁদের মাসিক আয়ের পরিমাণ দেখে। এই তীব্র কঠোর পরিশ্রমের মাসিক পারিশ্রমিক মাত্র প্রায় ১৫০০ টাকা, অর্থাৎ দিনে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। ফলে কারিগররা তাঁদের জীবনধারণের এই পেশা থেকে ক্রমশ বিমুখ হয়েছে। হাতের তৈরির পরিবর্তে যন্ত্রচালিত শাড়ির বুনোটে হারিয়ে গেছে অলঙ্করণের বৈচিত্র্য, শিল্পের মান। এই ধ্বংসের গল্পটা ইংরেজদের থেকে শুরু হলেও তা পরিণতি লাভ করেছে কালোবাজারির সময়ে। WBSA থেকে একটি রিপোর্টে বলা হয় যে, ১৯৪৫ থেকে সমস্ত বস্ত্র কারিগরের কাছ থেকে সুতোর ব্যাপক কালোবাজারির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পে সুতোর চোরাকারবারি ও মহাজন মিহির বাবু এবং তার সহকারী ভুবনের মতো বহু মানুষের দেখা মেলে তাঁতি পাড়ায়, যারা শিল্পীর প্রতিভাকে ধ্বংস করে তাদের দিয়ে তৈরি করাতে লাগল নিম্নমানের শাড়ি ও গামছা। কিন্তু বিলাসি মুর্শিদাবাদ সিল্ক বিপন্নতার পথে চলে গেল না। নবাবের আদেশে সৃষ্টি বালুচরি অথবা জমিদার গৃহিণীর পরনের গরদ, কোরিয়াল শাড়ি রয়ে গেল কোনওভাবে। গল্পের মিহির বাবুদের মতো কি মদন তাঁতিরাও ছিল যারা বাস্তবে বলতে পেরেছিল "মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে।" আজও বিয়ের কেনাকাটা হোক বা পুজোর মরশুম, কিংবা সেলিব্রেটিদের ফ্যাশন স্টাইল সবেতেই এই বনেদিশাড়ি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। যদিও করোনা পরবর্তীকালে সুতোর ও রঙের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমস্ত শাড়ির দামও মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের ফলে অধিক মূল্যের শাড়ির বাজারও কমেছে। যন্ত্রচালিত কারখানায় মালিকদের চাপে শিল্পীরা বাধ্য হয়েছে খারাপ মানের শাড়ি বুনতে। নকল বালুচরি, গরদ, কোরিয়াল শাড়িতে ছেয়ে গিয়েছে বাজার, মূল্য কম করতে সিল্কের পরিবর্তে সুতির শাড়িতে তৈরি হচ্ছে এই নকশা। যদিও অম্বিকা কালনার একজন কাঁথাস্টিচ শিল্পী ও তাঁতি খোকন নন্দীর সঙ্গে কথোপকথনে জানা গেল, ''মুর্শিদাবাদি সিল্কের অবস্থা বাংলার তাঁতের মতো তথৈবচ নয়। হাতে তৈরি এক্সক্লুসিভ বালুচরি,গরদের বাজার আজও বর্তমান। যন্ত্রচালিত সর্বগ্রাসী সভ্যতা মুর্শিদাবাদের সব শিল্পীকে আজও মজুরে পরিণত করে তুলতে পারেনি। শিল্পের প্রতি অহংকার, দায় ও ভালোবাসায় তারা বুনে চলেছে বাংলার ঐতিহ্য ও মর্যাদা। তারা আজও ঘরে অভুক্ত স্ত্রী ও অপুষ্টিজনিত শিশুকে রেখে বলতে পারে "মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে।" এই মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করেই অভিজাত ঘরের কাবার্ডে একটা তাক আজও বরাদ্দ থাকে মুর্শিদাবাদের সিল্কের জন্য।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ ও ইন্টারনেট

মডেল: ডিম্পল, স্নেহা
মেক-আপ: নবীন দাস, **ফোন:** ৯৮৩১২৩৩৬১৮
স্টাইলিং: তন্ময় বিশ্বাস, **ফোন:** ৯৮৭৪৬৫০৮৬৯
শাড়ি: কুনবি, **ফোন:** ৯১৬৩৪৫৫৫০০
রুপোর গয়না: করিশ্মাজ়
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭, **ছবি:** সোমনাথ রায়



এই বাংলার শাড়ি

বাংলা তাঁতের পাটভাঙা ও পথ চলা

বাংলার সংস্কৃতি, আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের এক অপরূপ রূপকথা তাঁতশিল্প। বহু পুরনো তার ইতিহাস। দিনবদলের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এখনও তার পথ হাঁটার অবিরাম প্রয়াস—যেন এক মুভি মনতাজ। ঐতিহ্যের আঙিনা থেকে অতিমারি-পরবর্তী দৃশ্যে কতখানি বদলেছে এই শিল্পের বিন্যাস? উত্তর খুঁজলেন পৃথা বসু।

রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর রচনায় লিখেছিলেন যে ফুলপাড়, নকশাপাড় বা জমি-জরিপাড় উরনির কথা, সেই তাঁতশিল্পের সুখ্যাতিতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

“বাংলার মসলিন বোগদাদ রোম চীন
কাঞ্চন তৈলেই কিনতেন একদিন
চরকার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর
ঘর ঘর সম্পদ আপনায় নির্ভর!”

মুঘল আমল থেকে ব্রিটিশ রাজত্ব হয়ে, শিল্পায়নের ধাক্কা সয়ে এখনও স্বগরিমায় নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে এই ঐতিহ্যবান শিল্প। বাংলার পল্লীশিল্পের প্রতীক এই তাঁতের শাড়ি যেমন নারীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়, তেমনই এদেশের জনগণের একটা বিরাট অংশও এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল জীবিকা অর্জনের তাগিদে। তাই শিল্পকর্ম ও কর্মসংস্থান, উভয় পরিসরেই গুরুত্ব রয়েছে তাঁতশিল্পের।

ঐতিহ্যের ঐকতান

তাঁতের আনুমানিক বয়স ৫০০ বছরেরও বেশি। প্রাচীনকালে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁতশিল্পের স্থান ছিল অগ্রগণ্য।



লালের উপর হলুদ ও নীলের সরু স্ট্রাইপড পাড়ের ধূসর রংয়ের ফুলিয়ার তাঁতের শাড়িটির জমি ও আঁচলে হ্যান্ডস্টিচের কাজ।

শাড়ি: মনপাখি, ফোন: ৬২৯০০২৮৯৫৫, গয়না: স্বস্তিক ক্রিয়েশন, ফোন:৭০৪৪৯৭৫২৩২



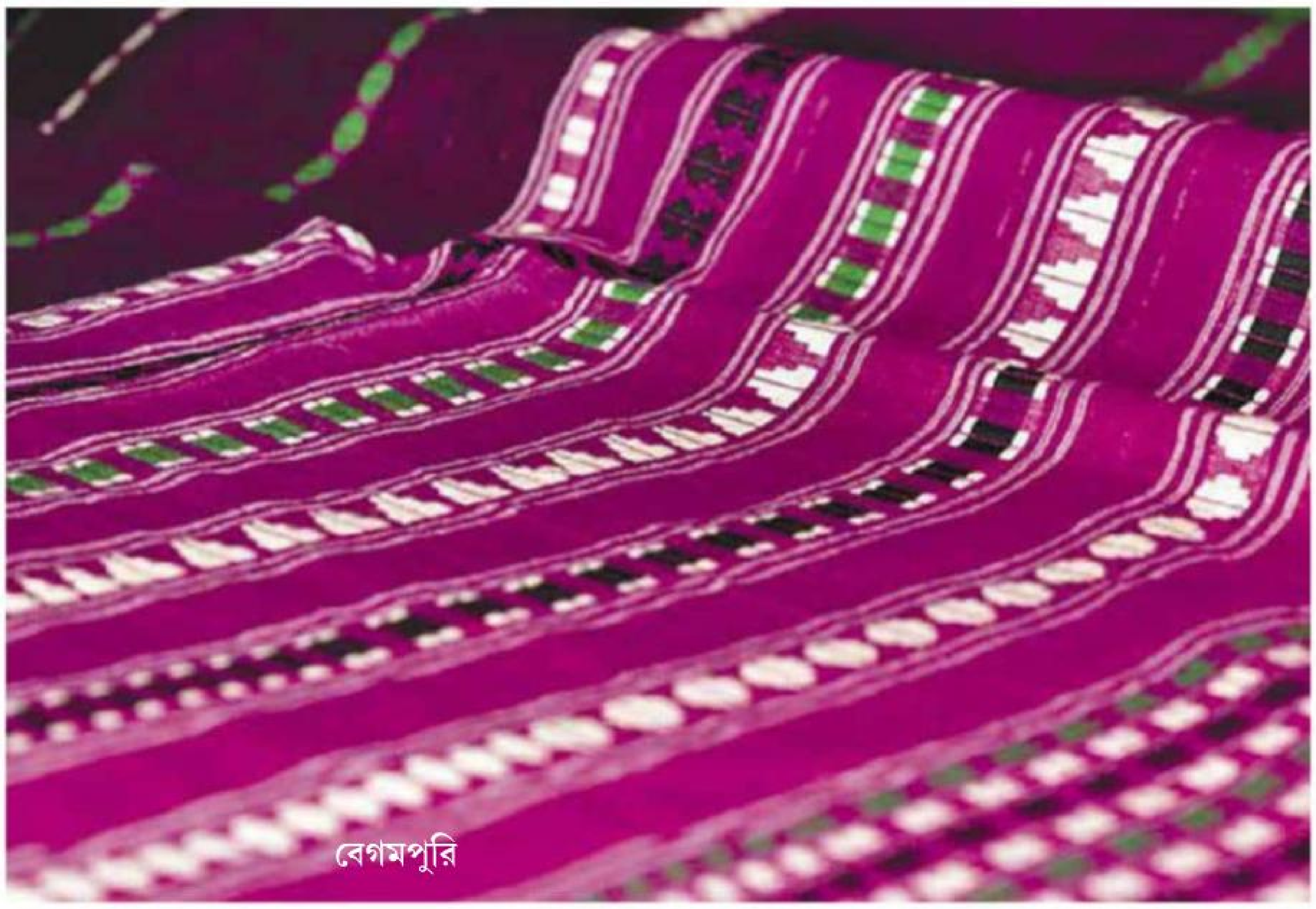
নীল খাদি কটন শাড়ি। চওড়া লাল পাড়। শাড়ির জমি জুড়ে সাদা সুতোর ভার্টিকাল স্ট্রাইপড ডিজ়াইন। লাল অফশোল্ডার ব্লাউজ়ের সঙ্গে ফিউশন লুক।

শাড়ি ও গয়না: মনপাখি

মুঘলযুগে ভারতে কাপড় তৈরির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলা। প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হত তখন এখানে। মুঘল আমলেই এই শিল্পের খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তবে তাঁত শিল্পের উদ্ভব-ইতিহাস সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল। মোটামুটিভাবে জানা যায়, যাযাবর শ্রেণির অন্তর্গত আদি বসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিরাই হলেন আদি তাঁতি। বসবাস ছিল সিন্ধু নদী অববাহিকায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সেই জায়গা ছেড়ে তারা চলে আসে অবিভক্ত বাংলার মুর্শিদাবাদে। ইতিহাস বলে, মণিপুরেও বহুদিন ধরেই তাঁতের প্রচলন ছিল। তাদের তৈরি তাঁতের সামগ্রী পরবর্তীকালে বাঙালি সমাজে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরিবারভিত্তিক এই শিল্পে বংশপরম্পরায় চলত তাঁত বুননের কাজ। তবে এই শিল্প কিন্তু কেবল পরিধেয় রূপে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। সময়ের তাগিদকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করে তাঁতশিল্পীরা শাড়ির পাড়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রতিবাদী নানা কবিতার নকশা । তারপর ধরা যাক, ১৯০৫ সালে ৭ অগস্টের সেই দিনের কথা। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে এক আন্দোলনের সূচনা হয়। বিদেশি পণ্য বর্জন করে স্বদেশী পণ্য গ্রহণ। এই দিনটির স্মরণে প্রতিবছর সারা দেশজুড়ে জাতীয় হস্তচালিত তাঁতদিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সরকারের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায় এই শিল্প। ম্যানচেস্টারে তৈরি কাপড় দিয়ে ভারতীয় বাজারকে ভরিয়ে দিতে চেষ্টা করে ব্রিটিশ সরকার। পাশাপাশি পরাতে থাকে নানা বিধি-নিষেধের শিকল। ফলে মুখ থুবড়ে পড়ে তাঁত শিল্প। কিন্তু দমে যায়নি। আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই শুরু করে এই শিল্প। বাংলা ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষির পরেই ছিল এর স্থান। প্রচলিত অর্থে বাংলার সবচেয়ে পুরনো ও বৃহত্তম শিল্প হল তাঁত শিল্প।

তাঁতের কাপড়ে নকশার বৈচিত্রহীনতা নিয়ে একটা অভিযোগ থেকেই যায়। তার কারণ খুব অল্প সংখ্যক তন্তুবায়েরই স্বকীয় নকশা তোলার ব্যাপারে স্বাভাবিক প্রতিভা থাকত এবং তারা হুকুম মাফিক কাজই করত। ফলত নকশা ভাল হত বটে, কিন্তু পরিমাণ বেশি হত না। আর সেটাও বাজারে আনার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষে বিক্রি হয়ে যেত। তাই ক্রেতাদের এই অভিযোগ মিটত না কিছুতেই। সেখান থেকে ধীরে ধীরে শুরু হল তাঁতে বোনা কাপড়ে কম্পিউটারের সাহায্যে নকশা তোলার রেওয়াজ। নতুন নতুন হরেক রকম নকশাও এল এবং এল আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। আধুনিক নারীর রুচি, পছন্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হতে থাকল নানা নকশা সমৃদ্ধ তাঁতের শাড়ি। তাঁতের শাড়িতে এল অ্যাপ্লিকের ছোঁয়া, কাঁথাস্টিচ কিংবা ব্লকপ্রিন্টের নানা প্যাটার্নও।





বেগমপুরি

নকশার প্রেক্ষিতেও শ্রেণিবিন্যাস হয়। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়া, শান্তিপুর, ধনেখালি, আতপুর, বেগমপুর, কালনায় তাঁতের কাপড় সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়। শাড়ির মান যেমন ভাল, তেমনই তার রংয়ের বাহার।

ফুলিয়ার 'টাঙ্গাইল'

বেনারসের নাম শুনলে প্রথমেই যেরকম মনে আসে বেনারসি শাড়ির কথা, সেরকম ফুলিয়ার কথা উঠলেই মনে পড়ে 'কবি কৃত্তিবাস' ও টাঙ্গাইলের কথা। টাঙ্গাইলের শাড়ি। তখন ইংরেজ আমল। বাংলাদেশের তাঁতিদের উপর শুরু হয়েছে প্রবল অত্যাচার। প্রাণ বাঁচাতে তারা পালিয়ে যাচ্ছে ওপার বাংলার চৌহাট্টা, ধামড়াই, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জায়গায়। বিশেষ করে টাঙ্গাইল মহকুমা তাঁতিদের সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে হল। সেখানেই তারা শুরু করল তাঁতের কাজ। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে গেল সেখানকার শাড়ি। মুখে-মুখেই নাম হল 'টাঙ্গাইল শাড়ি'। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই টাঙ্গাইল থেকে তাঁতশিল্পীরা এপার বাংলার ধাত্রীগ্রাম, সমুদ্রগড়, ফুলিয়া ইত্যাদি জায়গায় এসে থাকতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত বিধানচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় ফুলিয়ায় কলোনি গড়ে ওঠে। শিল্পীরা ফুলিয়ায় বসেই বুনতে শুরু করে সেই টাঙ্গাইল শাড়ি। বর্তমানে সারা ভারতে এই শাড়ি 'ফুলিয়ার টাঙ্গাইল' নামে পরিচিত। বস্তুত সারা দেশে ওপার বাংলার টাঙ্গাইলের বাজার দখল করেছে ফুলিয়ার টাঙ্গাইল। ট্র্যাডিশনাল

তাঁত বুনন পদ্ধতি

তাঁত হল মূলত একটি যন্ত্র, যা দিয়ে সুতো থেকে কাপড় তৈরি করা হয়। রেশম পোকার লালা থেকে উৎপন্ন হয় সুতো। প্রথমে রেশম গুটি জলে দিয়ে সেদ্ধ করা হয়। এই সুতো বের করা হয় অভিনব কায়দায়। একসঙ্গে ছয়-সাতটি রেশম গুটি থেকে সুতো বের করে, লাটাইয়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর টুইস্টার মেশিনের সাহায্যে সুতোটিকে পাকানো হয়। এবার 'তাসুন' পদ্ধতির মাধ্যমে সুতোগুলিকে লম্বালম্বি রাখা হয় ও পেটানো হয়। তাসুনের পর সুতোটিকে তাঁত যন্ত্রের অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি ছিদ্রের মধ্যে ঢোকানো হয়। এই পদ্ধতিকে বলে 'শানা'। তারপর সুতোটিকে আবার বোনা হয় ও কুন্ডলীর আকারে টানটান করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাঁত যন্ত্রে ঝুলনো হাতল টেনে সুতো জড়ানো মাকু আড়াআড়ি টানা হয়। লম্বালম্বি সুতোগুলোকে বলে 'টানা' আর আড়াআড়ি সুতোগুলোকে বলে 'পোড়েন।' শানার প্রথম কাজ হল টানা সুতোর খেইগুলোকে পরস্পর সামনাসামনি যথাস্থানে রেখে, লম্বালম্বি সুতোগুলোকে নির্দিষ্ট প্রস্থ বরাবর ঝুলিয়ে রাখা। শানাটিকে ঠিক জায়গায় রাখার জন্য নালা-কাটা কাঠ বসানো হয়, যার নাম 'মুঠ-কাঠ'। এবার আবশ্যকমতো প্রস্থ অনুযায়ী টানাটিকে একটি গোলাকার কাঠের উপর জড়িয়ে রাখা হয়, যাকে বলা হয় টানার 'নারাজ'। তাঁতি যেখানে বসে তাঁত বোনেন তাকে বলে 'কোল-নারাজ'। এভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁতিরা তাঁত বুনে থাকেন।

তাঁতের শাড়ির রকমফের

তাঁতের কাপড় যে অঞ্চলে বোনা হয়, সেই ভিত্তিতেই কাপড়ের শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। আবার অনেকসময় কাপড়ের উপর



ফুলিয়ার তাঁত



পাওয়ার লুম

টাঙ্গাইল শাড়ির চিরাচরিত 'আঁশপাড়' ছাড়াও পদ্ম, প্রদীপ অথবা লতা-পাতার মোটিফ দেখা যায় পাড়ে। শান্তিপুরি শাড়ির পাড়েও প্রায় এরকমই ডিজ়াইন চোখে পড়ে। এ' ধরনের শাড়ির পাড়ে আগে একটি রংই ব্যবহার করা হত। পরবর্তীতে শাড়িতে 'মীনাকারি'র আমেজ আনতে দুই বা তার বেশি রং ব্যবহার শুরু হয়।

প্রাচীন গ্রন্থ, সাহিত্য থেকে জানা যায়, নদীয়ার শান্তিপুর থেকেই বাংলা তাঁতের প্রসার। মুঘল আমলে তা আরও বৃদ্ধি পায়। সে সময় এই বাংলার বস্ত্র দিল্লি থেকে পৌঁচত ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও এই শিল্পের প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

শান্তিপুরি তাঁত

বাংলার তাঁতশিল্পের আরেক পীঠস্থান শান্তিপুর। প্রাচীন গ্রন্থ, সাহিত্য থেকে জানা যায়, নদীয়ার শান্তিপুর থেকেই বাংলার তাঁতের প্রসার। মুঘল আমলে তা আরও বৃদ্ধি পায়। সে সময় এই বাংলার বস্ত্র দিল্লি থেকে পৌঁছত ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও এই শিল্পের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ইংরেজ আমলের আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে শান্তিপুরে পাঁচশতাধিক কর্মচারী বাস করত। তাদের কাজ ছিল এখানকার তাঁত শিল্পীদের বোনা কাপড় সংগ্রহ করা ও রপ্তানির ব্যবস্থা করা। স্বদেশী আন্দোলনেও শান্তিপুরের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এই শাড়ির টেক্সচার খুবই সূক্ষ্ম বুননের হয়। রুচিশীলতার এক অন্য স্বাক্ষর তৈরি করে শান্তিপুরের তাঁত। লাল, কালো বা সবুজ রংয়ের সরু পাড় ও অফ-হোয়াইট জমিই শান্তিপুরি শাড়ির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যদিও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নানা ডিজ়াইনও শাড়িতে তুলেছেন তাঁতিরা।

ধনেখালির তাঁত

ধনেখালি তাঁতের বৈশিষ্ট্য ভাল মান ও কম নকশা। এই শাড়িগুলিকে আমরা প্রযুক্তিগত দিক থেকে সবচেয়ে নিখুঁত কাজ বলতেই পারি। মাত্র ২-৫ দিনে, অথচ নিটোল বুননে তৈরি হয়ে যায় এই শাড়ি। আসলে চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত যোগানের জন্যই এই ব্যবস্থা। দামও হয় কম। বিভিন্ন প্যাস্টেল শেডের উপর এই শাড়ি সাধ্যের আয়ত্তে থাকাতে, মধ্যবিত্তদের বেশ কাছের। এই মৌলিকতাই ধনেখালির শাড়িকে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছে। তবে শাড়ির চেয়েও বেশি জনপ্রিয় এখানকার ধুতি।



শান্তিপুরি তাঁত

বেগমপুরি তাঁত

বেগমপুরের শাড়ির ওজন খুব হালকা হয়। জনৈক তাঁতির কথায়, বেগমপুরি তাঁতের মান এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভাল এবং দিন দিন তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানকার শাড়িগুলি খুব উজ্জ্বল রংয়ের হয়। এটাই ধনেখালি তাঁত থেকে বেগমপুরি তাঁতকে আলাদা করে। স্বল্প যত্ন-আত্তিতেই এই শাড়ি টেকে অনেকদিন।

অন্যান্য

আতপুরের তাঁত দৈনন্দিন পরার জন্য তৈরি হত। আমরা 'আটপৌরে' শাড়ি বলতে যা বুঝি, তা এই এখানকারই তাঁত। বর্ধমানের কালনাতেও বোনা হত টাঙ্গাইল তাঁত। এছাড়া বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁত, তাদের নিজ বৈশিষ্ট্যে এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যদিও বলা বাহুল্য, সময়ের চাকায় এখন তার অনেকগুলিই বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁতিরা বদলে নিয়েছে তাদের পেশা। বিশেষ করে কোভিডের পরে আমূল পরিবর্তন এসেছে তাঁতশিল্পের জগতে।

সংকট, বিহ্বলতা ইত্যাদি

এই শিল্পের চলার পথ কোনও দিনই মসৃণ ছিল না। বন্ধুরতাই তার চিরটাকালের দোসর। ব্রিটিশ আমলে বিদেশ থেকে আমদানি করা সুতিবস্ত্র এবং সরকারের অবহেলায় তাঁতশিল্পকে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তারপরে আসে শিল্পায়নের ধাক্কা, যা তাঁত শিল্পকে গভীর সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ঐতিহ্য ধরে রাখা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদিও সরকারী এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে নেওয়া নানা প্রকল্পের কারণে ধীরে ধীরে এই শিল্পে শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে। যার সিংহভাগই নারী। বাংলার, বিশেষ করে হুগলি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কারিগররা নানা সুতোর নিপুণ বুননে তাদের শাড়িকে যেভাবে তৈরি করেন, তা এককথায় অনবদ্য। নানা সময় নানা তাঁত সমবায় তৈরি হয়েছে তাঁতিদের নিয়ে। এই সমবায়গুলি তাঁতিদের সবরকম সাহায্যও করত। কিন্তু বর্তমানে এখানে তাঁতির সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তার অন্যতম কারণ বাজারের অভাব, কাঁচামালের দর বেড়ে যাওয়া এবং সব মিলিয়ে তাদের মোট আয় কমে যাওয়া। যন্ত্রচালিত ও হস্তচালিত তাঁতের দ্বন্দ্ব ও সেই সূত্রে তাঁতিদের কাজ ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে। যে তাঁত একটা সময়





হ্যান্ডলুম

বনেদিনায় সামিল হয়েছিল, সেটি হয়ে পড়ল কেবল উৎসবকেন্দ্রিক। পুজোর আগে বা চৈত্র সেলেই অস্তিত্বের সাদা পতাকা হাতে রাখল ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প। তাঁত সমবায়গুলি থেকেও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা কমে যেতে থাকল। ধনেখালির তাঁত তো ধীরে ধীরে আজ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। যদিও সরকারের তরফ থেক এ' নিয়ে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন ফ্যাশন শো; তাঁতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন লক্ষে গড়ে তোলা হয়েছে 'মডেল গ্রাম'। তবু কারিগররা আছে একই রকম সংকটে। বরং কালে কালে তা বেড়েছে বই কমেনি। অতিমারির গ্রাসে আরও দুরাবস্থার কবলে পড়েছে তাঁতশিল্প ও কারিগররা। সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবনতির ভয়ঙ্কর শিকার হয়েছে তাঁতশিল্প। এ যাবৎ এই বিষয়টা স্পষ্ট যে, তাঁতশিল্পের হাল হকিকত আগেও খুব ভাল ছিলনা। উপরন্তু পরপর দুবারের লকডাউন কার্যত তার অস্তিত্বকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে ফেলেছে। আজকের বাজার দখল করেছে নানা সিন্থেটিক মেশানো, অপেক্ষাকৃত কম দামের বিভিন্ন শাড়ি। যুগ ও হুজুগের 'ট্রেন্ডি ফ্যাশন'-এর ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে ইতিহাস পেরনো এক শিল্প। 'অপুর সংসার'-এ বন্ধু পলুকে অপু এক গ্রামের ছেলের গল্প বলতে গিয়ে বলেছিল মনে আছে, "...তার দারিদ্র্য যাচ্ছে না, অভাব মিটছে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জীবনবিমুখ হচ্ছে না, পালাচ্ছে না"। আমাদের তাঁতও সেই ছেলেটিই যেন। ধুঁকতে ধুঁকতেও এগিয়ে চলেছে ঠিক। কিন্তু অন্তিমে প্রশ্নগুলো তো বড় সহজ—'আর কতদিন?'... উত্তর কি জানা?

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ, ইন্টারনেট

মডেল: মুনমুন, ডিম্পল
মেক-আপ: নবীন দাস, **ফোন:**৯৮৩১২৩৩৬১৮
স্টাইলিং: তন্ময় বিশ্বাস, **ফোন:**৯৮৭৪৬৫০৮৬৯
ছবি: সোমনাথ রায়



কাঁথাস্টিচের কথকতা

কাঁথাস্টিচ মানেই সূচ-সুতোর সংসার। বাংলার শাড়ির ইতিহাসের এই রঙিন অধ্যায়ের পাতা ওলটালেন অনিকেত গুহ।

"নক্সী-কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত
আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যাথার
বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।"

জসীমউদ্দিন তাঁর জীবনের অনেকখানি রসদ ঢেলে সাজিয়েছিলেন এই কাব্য 'নক্সী কাঁথার মাঠ'। শুধু সাহিত্যে নয়, বাংলার সমাজ, সাজসজ্জার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে কাঁথাস্টিচ। বাস্তবে অঙ্গসজ্জা নয়, বরং ঘরোয়া সমস্যার সহজ সমাধানের হাত ধরেই বঙ্গে কাঁথার প্রবেশ। ধীরে ধীরে বদলাল কাঁথার ব্যবহার, বদল এল সুতোর টানে। আসন, চাদর, তাকিয়া ছেড়ে কাঁথাস্টিচ উঠল শাড়ির ভাঁজে। বাকিটা ইতিহাস। সূচ-সুতোর এই যুগলবন্দি হয়ে উঠল বঙ্গ নারীর অঙ্গ। প্রায় সাতশো বছর পুরনো এই টেকনিক আজও নজর কাড়ে। এই লেখা বাংলার শাড়ির ইতিহাসে কাঁথাস্টিচের মাইলফলক ছুঁয়ে দেখার এক নিরলস প্রয়াস।

পুরনো সেই দিনের কথা

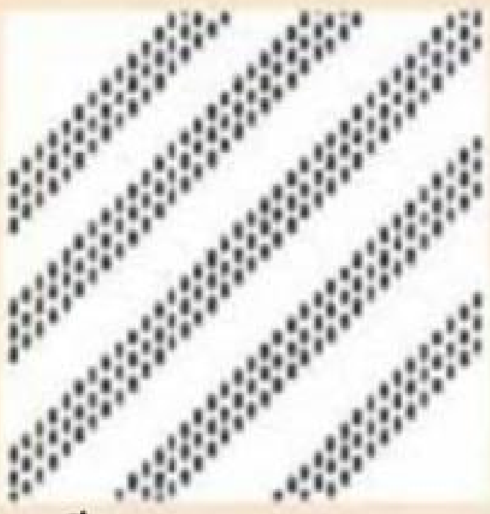
নকশি কাঁথার ইতিহাস তার সুতোর মতোই রঙিন। শাড়িতে পাকাপাকি ভাবে স্থান পাওয়ার অনেক আগে লাইমলাইটে আসে কাঁথাস্টিচ। প্রথমদিকে শিশুদের কোলে নেওয়া, সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র ঢাকা ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে কাঁথার ব্যবহার হত। একাধিক কাপড় সমানমাপে উপর নিচে রেখে স্তরে স্তরে সুতোর বাঁধনে তৈরি হয় কাঁথা। এতে কাজের চাহিদা মিটিল। মনের পিপাসা নয়। শুরু হল সূচে-সুতোয় এক্সপেরিমেন্ট। রুচিশীল বাঙালির স্বকীয়তা প্রকাশের



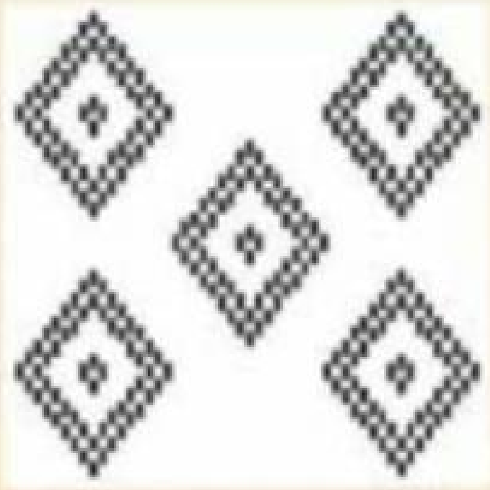
শাড়িতে কাঁথাস্টিচের নকশা



তারা ছুটকি



লাঠি



আয়না খোপা

ক্যানভাস হয়ে উঠল কাঁথা। ঘরে-ঘরে শুরু হল ছক ভাঙার অধ্যায়। চারপাশের গাছপালা, ফুল, পাখি, বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন, জ্যামিতিক আকার সবকিছুই হয়ে উঠল কাঁথাস্টিচের সাবজেক্ট। বীরভূম, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়ার প্রতিটি ঘর হয়ে উঠল কাঁথাস্টিচের আড়ত। সে সময় মসলিন কাপড়ের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। সুতি থেকে রেশম সবেতেই ফুটে উঠল কাঁথাস্টিচের নকশা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ‘চৈতন্য চরিতামৃত’তে সুদৃশ্য কাঁথার বর্ণনা করেছেন। নিয়াজ় জামনের লেখা ‘The Art of Kantha Embroidery’ থেকে জানা যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে জনৈক এক বৃদ্ধার সাক্ষাৎ পান যিনি তাঁর বিবাহ থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের সকল অভিজ্ঞতা সূচ-সুতোয় ফুটিয়ে তুলেছেন। কাঁথাস্টিচ শুধুমাত্র একটা বুনন পদ্ধতি নয়, মানুষের জীবনের ভাঙাগড়া, আবেগ-উৎকণ্ঠা সবকিছুই ধরা পড়েছে কাঁথাস্টিচের বাঁধনে। শাড়িতে কাঁথাস্টিচের প্রবেশ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনও সময় সারণি পাওয়া যায় না। শোনা যায় মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ নিজেই ছিলেন নৃত্যগীতে পারদর্শী। তিনি নিজে কাঁথা বা মোটা কাপড়ের উপর নকশা করার জন্য বাংলা থেকে কারিগর ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময়েে দাঁড়িয়েও বাংলা ছিল কাঁথাস্টিচ বা সুতোর কাজের পীঠস্থান।

ধরন ও বুনন পদ্ধতি

কাঁথাস্টিচের নকশার মতো তার শাড়ি তৈরির পদ্ধতিতেও আছে বহু বাঁক। শাড়িতে সূচ-সুতোর বাঁধনে ফুটিয়ে তোলা হয় রঙিন সব কারুকাজ। সম্পূর্ণ শাড়িতে বুনন শুরু করার আগে শুরু হয় শাড়ি টান করার পর্ব। মেটালের তৈরি চ্যাপ্টা তলদেশ যুক্ত হাঁড়ি আগুনের আঁচে উত্তপ্ত করে শাড়ি ফ্ল্যাট করার কাজ হত। খানিকটা এখনকার আয়রনের মতো। এরপর চারকোল বা প্রাকৃতিক রঙে রেঙে ওঠে শাড়ির পাড়। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে দুই আলাদা ধরনের পাড় তৈরির পদ্ধতি দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে শাড়ির পাড় থেকে সুতোর কাজ ছড়িয়ে পড়ে গোটা শাড়িতে। এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। শাড়ি ও পাড়ে

চারপাশের গাছপালা, ফুল, পাখি, সাংকেতিক চিহ্ন, জ্যামিতিক আকার সবকিছুই হয়ে উঠল কাঁথাস্টিচের সাবজেক্ট। বীরভূম, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়ার প্রতিটি ঘর হয়ে উঠল কাঁথাস্টিচের আড়ত।

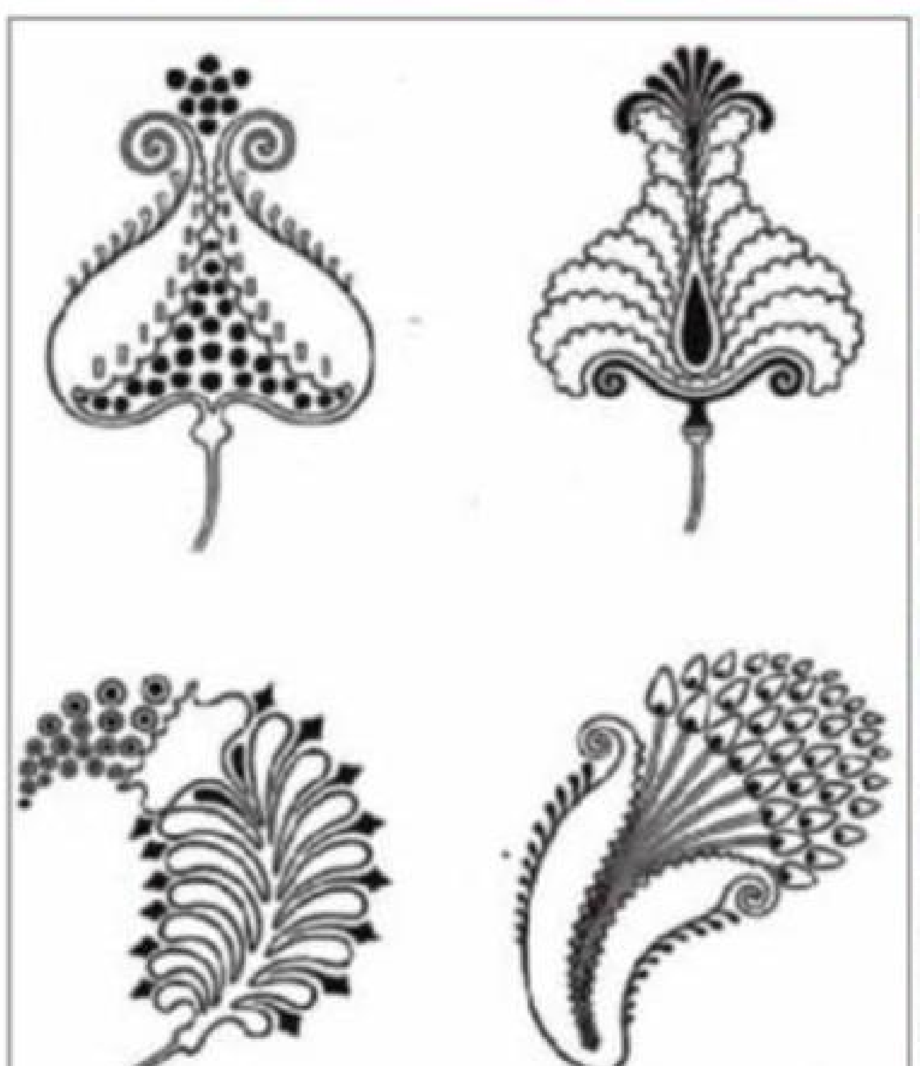
আলাদাভাবে তোলা হয় সুতোর কাজ। কাঁথা হোক বা শাড়ি; পাড়ের তারতম্য চোখে পড়ার মতো। ‘বেঙ্কি পাড়’, ‘লহর পাড়’, ‘খেজুরকাঁটা পাড়’, ‘সিম-লতা পাড়’, ‘মাকু পাড়’, ‘গাছ পাড়’ সুতোর বাঁধনে তৈরি হয় এরকমই প্রায় চল্লিশ রকমের পাড়ের ধরন। শাড়ির রঙেও চোখে পড়ে বৈচিত্র্য। কাঁথাস্টিচের শাড়িতে সুতোর ব্যবহারও খুব ইন্টারেস্টিং। পাড়া-গাঁ-র মহিলারা উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য অব্যবহৃত শাড়ি বা ধুতি থেকে সুতো নিয়ে নতুন শাড়িতে তোলেন মনের মতো নকশা। হাতের মুনশিয়ানায় প্রতিষ্ঠা হয় নতুন নকশার প্রাণ। কাঁথাস্টিচে সুতোর কারিগরি



হাতির মোটিফ



শাড়িতে তোলা হচ্ছে কাঁথাস্টিচের বুনন



ট্র্যাডিশনাল মোটিফ



কলকার মোটিফ

ফুটিয়ে তোলার জন্য কাপড়ের বেস সাদা বা কোনও হালকা রঙের হয়ে থাকে। যদিও এখন সেই গাইডলাইন বিশেষ মানা হয় না। শাড়ির জমি জুড়ে দেখা যায় হাজারও রকম নকশা। কুমোরের চাকা, তাসের প্রকার, বাহারি গাছ, রঙিন ফুল এমনকি ছোট শিশুর ছবিও লক্ষ করা যায় কাঁথাস্টিচের নকশায়। দেখা যায় জাতিগত বৈচিত্র্যের ছাপ। স্বস্তিক চিহ্ন, জীবনবৃক্ষ, পালকি, পদ্মফুল নকশাগুলি হিন্দুধর্মের বার্তাবাহক। আবার বরফি, চারকোণা ক্ষেত্র, ত্রিভুজ তথা জ্যামিতিক আকৃতির নকশা মুসলিম শিল্পনৈপুণ্যের প্রতীক। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে স্থানীয় মুসলিম মহিলারা বিশেষ কিছু নকশার ধরন তৈরি করে থাকেন। 'তারা ছুটকি', 'লাঠি', 'আয়না খোঁপা' এই বিশেষ ধরনগুলির অন্যতম। অনেকক্ষেত্রে নকশায় বৌদ্ধ ধর্মের ছোঁয়াও লক্ষ করা যায়। বটগাছ বা পিপুল গাছের নকশা গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও বোধিলাভের ঘটনাকে নির্দেশ করে। পশ্চিমবঙ্গে স্থানভেদে পাড় ও আঁচলের নকশার বিবিধতা রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। শিউলি, টগর, চেরি, ইলিশ মাছ--নকশাগুলি বাংলার প্রতিটি রমণীর শাড়িবিন্যাসে ভাস্বর হয়ে আছে। শুধু বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপন নয়; কাঁথাস্টিচের নকশা স্থানীয় লোককথা বা লোকগানের সাক্ষ্য বহন করে। লৌকিক দেবতা থেকে শুরু করে লোকগানের চরিত্র—কাঁথাস্টিচের ফুটপ্রিন্ট সর্বত্র। শাড়িতে নকশা তোলার পদ্ধতিরও একাধিক ধরন রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় 'রানিং স্টিচ'-এর নাম। কাঁথা, শাড়ির পাড় বা আঁচলের নিঁখুত নকশা—রানিং স্টিচের জয়জয়কার সর্বাংশে। প্রকৃতপক্ষে এই বুনন পদ্ধতিই বাংলায় কাঁথাস্টিচ নামে পরিচিত। কোনও ডিজ়াইনের আউটলাইন তৈরি করার জন্য 'স্টেম স্টিচ'-এর ব্যবহার হয়। 'হেরিংবোন স্টিচ'-এর দরকার পড়ে বড় ধরনের কোনও নকশা ভরাটের কাজে। এছাড়াও 'লুপ স্টিচ', 'ডার্নিং স্টিচ' ইত্যাদি শাড়ির অভিনবত্বের দাবিদার। বুনন পদ্ধতি যাই হোক না কেন, শাড়ির মাহাত্ম্য আজও অটুট। স্থান-কাল-সীমানার গণ্ডি ছেড়ে কাঁথাস্টিচের নকশা এভাবেই সূচে-সতোয় ঘর বেধেঁছে বাংলার মানুষের মনে।

বাংলায় কাঁথাস্টিচের তারতম্য

মুর্শিদাবাদ: শাড়িতে মূলত রানিং স্টিচের ব্যবহার দেখা যায়। আঁচল ও পাড়ে ময়ূর, হাতি, পেঁচা, পানপাতা ইত্যাদির প্রাধান্য বেশি।

বীরভূম: বর্তমানে বোলপুর, শান্তিনিকেতন কাঁথাস্টিচের প্রাণকেন্দ্র। সিল্ক, তসর, সুতি—কাঁথাস্টিচের নকশায় তৈরি হচ্ছে শাড়ি। এক-একটি শাড়ির বুননে সময় লাগে প্রায় এক-



কাঁথাস্টিচের নকশার আদলে 'গয়না বড়ি'



সুজনি কাঁথা

ছায়াসঙ্গী এই শাড়ি। কাঁথাস্টিচ এই বিজয়গাঁথার এক গৌরব অধ্যায়। সরোজিনী নাইডু থেকে সুচিত্রা সেন; বাংলার সীমানা পেরিয়ে কাঁথাস্টিচের শাড়ি জায়গা করে নিয়েছে বিশ্ব মানচিত্রে। গ্লোবালি বিভিন্ন এগজ়িবিশনে নজর কাড়ছে কাঁথাস্টিচের উত্থান। চলছে কোভিড-পরবর্তী সময়ে ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য লড়াই। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নতুন করে প্রাণ পাচ্ছে বাংলার এই শাড়ির ঐতিহ্য। প্রতিবন্ধকতার আগল সরিয়ে আমাদের আঁচলে আবার ফুটে উঠছে কাঁথাস্টিচের নকশা!

মডেল: রিয়া, স্নেহা, **মেক-আপ:** বাবুসোনা সাহা, **ফোন:** ৮২৪০৫৫০৮৮৪,
নবীন দাস (স্নেহা), **ফোন:** ৯৮৩১২৩৩৬১৮,
স্টাইলিং: অয়ন হোড় (রিয়া), **ফোন:** ৯০০৭২২০৪৯৬, তন্ময় বিশ্বাস (স্নেহা)
ফোন: ৯৮৭৪৬৫০৮৬৯, **শাড়ি:** সন্ধ্যারাগ বুটিক, **শাড়ি (স্নেহা):** সেলফ স্টেরি বাই শান্তনু গুহঠাকুরতা ও সুমিত ঘোষ চৌধুরী, **ফোন:** ৯৭৪৮৭৫৬৩৬৪, **ছবি:** সোমনাথ রায়

দু'সপ্তাহ। কখনও প্রায় এক মাস।

মালদা: শাড়ির জমি ও আঁচলে 'ওয়েভ' বা তরঙ্গ সদৃশ ডিজ়াইন দেখাযায়। জ্যামিতিক ধরনের উপর হালকা থেকে ভরাট কাজ দেখা যায়।

দিনাজপুর: শাড়ির বহর অপেক্ষাকৃত বড়। বিভিন্ন ধরনের পাখি, ফুল লক্ষণীয়।

নদীয়া: 'সুজনি', 'দুর্জনি' ইত্যাদি স্থানীয় কাঁথাস্টিচের ধরন। এর মধ্যে সুজনি ধরনটি GI Tag প্রাপ্ত। প্রচলিত হিন্দু বিবাহ রীতি, গ্রাম-বাংলার মাটির ঘরের আলপনা বিশেষভাবে দেখা যায় সুজনি-তে।

চব্বিশ পরগনা: এই অঞ্চলের কাঁথাস্টিচের ইতিহাস দীর্ঘ। দুই বাংলার প্রায় সবধরনের বুনন পদ্ধতি এখানে লক্ষণীয়। শাড়ির পাড়, আঁচল, কুঁচি জুড়ে থাকে রঙিন নকশার উপস্থাপনা। লৌকিক দেবদেবী, প্রাত্যাহিক জীবন ও মহাকাব্যের চরিত্রের বিশেষ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 'অরন্ধন' একটি এক্সক্লুসিভ স্টিচের ধরন যা শাড়ি ও কাঁথা উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

মেদিনীপুর: প্রান্তিক বা আদিবাসী শিল্পের আংশিক মেলবন্ধন লক্ষ করা যায় কাঁথাস্টিচের বুননে। নারীদের গয়নার বিভিন্ন প্রতিরূপ শাড়ির আঁচলে ফুটে উঠে। কাঁথাস্টিচের এই বিশেষ ধরন থেকেই উঠে এসেছে বাংলার বিখ্যাত 'গয়না বড়ি'।

কাঁথাস্টিচের পট-পরিবর্তন

সময় পরিবর্তনের সঙ্গে বদল এসেছে কাঁথাস্টিচের ক্যানভাসে। আধুনিকতার রং লেগেছে শতাব্দী প্রাচীন এই বুনন পদ্ধতিতে। কালো, লাল, নীল বা হলুদ — বেসিক এই রংগুলোর জায়গায় এসেছে ম্যাজেন্টা, মাস্টার্ড-ইয়ালো, ক্রিমসন, অরেঞ্জ ইত্যাদি রঙের ব্যবহার। বদল এসেছে স্টিচিং পদ্ধতিতেও। রানিং স্টিচ, স্টেম স্টিচের জায়গায় এসেছে ক্রস, ব্যাকক্রস, হেরিংবোন স্টিচের ব্যবহার। আধুনিকতার সান্নিধ্যে শাড়ির ভরাট কারুকার্য বদলেছে সূক্ষ্ম সুতোর কাজে। ভারী শাড়ির পরিবর্তে হালকা সিল্ক বা হ্যান্ডলুমের উপর তোলা হচ্ছে নকশা। তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা।

দিনবদলের দিনলিপি

কোভিডের ধাক্কায় বদলেছে আট থেকে আশি সকলের জীবন। প্রায় দেড় বছর লকডাউনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তাঁতির ঘরেও। বেড়েছে রঙের দাম, কমেছে সুতোর জোগান। এই দু'য়ের সাঁড়াশি আক্রমণে বাজারে কাঁথাস্টিচ শাড়ির দাম বেড়েছে অনেকটাই। কাটছাঁট হচ্ছে বাজারমুখি ক্রেতার তালিকা। বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে তাঁতিদের অবস্থাও শোচনীয়। কাঁথাস্টিচে ব্যবহৃত সুতোর বল্গাহীন দামবৃদ্ধিতে হ্যান্ডলুম শাড়ির চাহিদা নিম্নমুখী। তুলনায় পাওয়ারলুমে তৈরি শাড়ির দর কিছুটা আয়ত্তে। হাতের কারিগরি ছেড়ে তাই অনেকেই ঝুঁকছেন যান্ত্রিকতায়।

বঙ্গ সংস্কৃতিতে 'শাড়ি' ও 'নারী' শব্দ দুটি সমার্থক। বাঙালিনীদের বিজয়গাঁথার





এই বাংলার শাড়ি

ছিন্নমূল মসলিনের এপারের বুনন

রোমান গ্রন্থ 'পেরিপ্লাস অফ দ্য এরিথ্রিয়ান সি', শাড়িতে মুগ্ধ হয়েছে, যার খোঁজে সুদূর ইউরোপের বাণিজ্যতরী নোঙর ফেলেছে বাংলার মাটিতে, সেই মিহি সুতোর কিংবদন্তি খণ্ডিত হয়েছে কাঁটাতারের আঘাতে। ছিন্নমূল এই শাড়ি এ বাংলায় কেমন আছে? তার গল্প শোনালেন দেবলীনা অধিকারী।

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পে 'দ্রৌপদী মেঝেন' যখন শত অত্যাচারের পর উঠে দাঁড়ায়, তখন পাশে পড়ে থাকা সেই শাড়ি অনেক কিছু বলে। শাড়ি সবসময় গল্প বলে ফেলে আসা দিনের, প্রাচীন সমৃদ্ধির, ঐতিহ্যের আবার কখনও অখণ্ড বাংলার। মসলিন শাড়িও বাংলার বহু ঐতিহ্যের গল্প শোনায়। এই শাড়ির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে কাঁটাতারের ইতিহাস। গঙ্গা-পদ্মার জল, অখণ্ড বাঙালির হৃদয়, ভাষা এই রকম অন্যান্য অনেক কিছুর মতো ভাগ হয়ে গিয়েছিল বাংলার গর্বের মসলিন। জন্ম হয়েছিল পশ্চিমবাংলার মসলিনের। কারণ এই মসলিন শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রয়ে গেছে অখণ্ড বাংলা। এই দেশভাগ বাংলা ভাষার মতো মসলিনের গৌরবকেও ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু তার পরও মসলিন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বর্ধমান, নদিয়ার শিল্পীদের হাত ধরে। আবার সৃষ্টি হচ্ছে কিংবদন্তি শাড়ির ইন্দ্রজাল। এই ছিন্নমূল মসলিনের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রবণতা জানার জন্য অখণ্ড মসলিনের ইতিহাসের কাছেই আমাদের যেতে হবে।



মসলিনের অতীত গৌরব

শোনা যায় একটা আংটির মধ্যে গলে যেত একটা আস্ত শাড়ি। কেবল আংটি নয়, ছোট দেশলাই বাক্সের মধ্যে নাকি রপ্তানি হত এই মসলিন। এমনও কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে মুঘল আমলে তৈরি মসলিন ঘাসের উপর রাখলে আর তার উপর শিশির পড়লে সেই মসলিন নাকি দেখাই যেত না, এতই সূক্ষ্ম ছিল এর বুনন। কয়েক গজ শাড়ি উড়ে যেত ফুঁ দিলে, ফলে তার পোশাকি নাম 'হাওয়া শাড়ি' ছিল বলেও মনে করা হয়। বহু বিদেশি ঐতিহাসিক, পর্যটক মসলিনের বুননে মুগ্ধ হয়েছেন। খ্রিস্টিয় নবম শতকে আরব পর্যটক ও ভূগোলবিদ সুলেমানের 'সিলসিলাত-উৎ-তাওয়ারিখ' গ্রন্থে মসলিনের প্রশংসা আছে। ইবন বতুতার গ্রন্থেও এই শাড়ির সূক্ষ্মতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি' গ্রন্থেও এই মসলিনের মিহি



আইস ব্লু রঙের হাফ কটন মসলিন সিল্ক শাড়ির আঁচলে ভরাট জরির কাজ। জমি জুড়ে হালকা জড়ির বুটি। সিকুইন ব্লাউজের সঙ্গে পার্টি লুক।


যন্ত্রে শাড়ির বুনন

জনশ্রুতি ছিল বিদেশি জাহাজ ভারতের বন্দরে ভিড় করত দক্ষিণের গোলমরিচ ও বাংলার মসলিনের উদ্দেশে। এর মূল্য ছিল সোনার মতো মহার্ঘ্য।

বুননের আশ্চর্য গাথা লেখা আছে। মসলিনকে নিয়ে রচিত এইসব গাথাকে কখনও কখনও রূপকথা বলে মনে হলেও এই মিহি বুননের ঐতিহাসিক সত্য এই সমস্ত গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। মসলিনের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় চারশো বছর আগে। রোমানদের হাত ধরে বাংলার মসলিন বিশ্বদরবারে স্থান পায়। এদের কাছে মসলিন ছিল মহার্ঘ্য, সোনার চেয়েও মুল্যবান। সোনার বিনিময়ে তারা মসলিন আমদানি করত রোমে। রোমের হাত ধরে সমগ্র ইউরোপ পরিচিত হতে লাগল এই মিহি বুননের সঙ্গে। জনশ্রুতি ছিল বিদেশি জাহাজ ভারতের বন্দরে ভিড় করত দক্ষিণের গোলমরিচ ও বাংলার মসলিনের উদ্দেশে। এই শাড়ির আমদানির বিনিময়মূল্য ছিল হাঁতির দাঁত, কচ্ছপের খোল, গন্ডারের শিঙের মতো বস্তু। এই মসলিন শব্দটি উৎস 'মসুল', যেটি ইরাকের এক বিখ্যাত ব্যবসায়িক কেন্দ্র। সেখানেও নির্মিত হত এই সূক্ষ্ম শাড়ি। এই কারণেই ইংরেজরা এই কাপড়ের নাম দেন 'মসলিন'। ইংল্যান্ডের কার্পাস শিল্পের জনক বেইন্সকেও ধাঁধায় ফেলে দেয় বাংলার এই মিহি সুতোর বুনন। ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে এই মিহি বুননের সুতো জন্মাত। নাম ছিল 'ফুটি'। তা ছাড়াও 'বয়রাতি', 'দেশি' প্রভৃতি সুতোরও সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও এইসব সুতোর তৈরি কাপড়ের মান ছিল খানিক নিম্নমানের। তবে রাজা, মহারাজের জন্য তৈরি মসলিন শাড়ি 'মলমল' নামে বিখ্যাত ছিল। এই একটা শাড়ি তৈরি করতে তাঁতিদের লেগে যায় অনেক সময় ৫ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত। এই মিহি সুতোর বুনন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইংরেজ আমলে। স্বাধীনতা পরবর্তী এই শাড়িকে সহ্য করতে হল দেশভাগ, কাটাঁতারের ক্ষত। বাংলার বিশ্বজোড়া এই শাড়ির গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের সময় যখন এল, তখন খণ্ড বাংলার সঙ্গেই খণ্ড হয়ে গেল বাংলার গৌরবের শাড়ি। পৃথক হল এপার বাংলা-ওপার বাংলার মসলিন। পশ্চিমবাংলায় নতুন করে জন্ম নিল মসলিনের শাড়ি, শুরু হল মিহি সুতোর বুনন।

বাংলার মসলিন

'পরথমে পাইরাইল শাড়ি, নামে গঙ্গার জল। নুখেতে লইলে শাড়ি, আরও করে টলমল! পানিতে থইলে গো শাড়ি, শাড়ি পানিতে মিলায়, শুখানায় থইলে শাড়ি ভাইরে, পিঁপড়ায় টাইন্যা লইয়া যায়'। ওপার বাংলার গত শতকের যাত্রা 'সোনাই বিবি' পালাতে এই আশ্চর্য বুননের বর্ণনা পাওয়া যায়। যে ঐন্দ্রজালিক বুননে মুগ্ধ হয়েছিলেন রোমের সুন্দরী থেকে মুঘল রাজরানি। এই মসলিন রপ্তানি হত প্রাচীন মিশরে, যার প্রমাণ মমির দেহে প্রাপ্ত মসলিন কাপড়। এই আশ্চর্য বুননের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য পশ্চিমবাংলায় এই মুহূর্তে নিয়োজিত প্রায় ১৬ থেকে ১৭ হাজার শিল্পী। কার্পাস তুলো থেকে নির্মিত হয় মসলিন শাড়ি। যদিও এই উৎকৃষ্ট মানের তুলো পূর্ববঙ্গেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় কিছু কিছু জায়গায় সম্প্রতি এই তুলোর চাষ হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের সুভিন তুলোও এই মিহি বুননের উপযুক্ত। মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম হয় এই শাড়ি। তার জন্য ভোর চারটে থেকে শুরু হয় সূক্ষ্মতার সাধনা। এই সাধনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন একজন তাঁতির গোটা পরিবার। সুতো যত পাতলা হবে, ততই সম্ভব হবে ঐন্দ্রজালিক মিহি বুনন। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, বীরভূম, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বর্ধমানের তাঁতিরা এই কাজে যুক্ত রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মসিলনের এক লেছিতে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ সুতো থাকে, যার ওজন হয় এক গ্রাম আশি মিলিমিটারেরও কম। ১১ মিটার কাপড়ের জন্য এমন প্রায় ২৪০ লেছির প্রয়োজন। এই অবিশ্বাস্য কম ওজনের লেছি নির্মাণের পর দুদিন তাকে লেবুর জলে ভিজিয়ে রাখার পর ভাতের মাড় মাখানো হয়, আর সাধারণত এই কাজ করে থাকেন তাঁতি ঘরের মেয়েরা। এই হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে নির্মিত হয় ৫০০ কাউন্টের উৎকৃষ্ট মসলিন। মুর্শিদাবাদের চকইসলামপুর, মালদহ, কালনার সমুদ্রগড়, অম্বিকা কালনা, নদীয়ার নবদ্বীপ জুড়ে রয়েছেন এই ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পীরা। যাঁরা ছিল পূর্ববঙ্গের সোনাগাঁওয়ের বাসিন্দা। যাঁদের মিহি বুননে এপার বাংলায় পুনরায় নির্মিত হয় সেই



হাতে তৈরি মসলিন



ইতিহাসের পাতায় মসলিন

কার্পাস তুলো থেকে নির্মিত হয় মসলিন শাড়ি। যদিও এই উৎকৃষ্ট মানের তুলো পূর্ববঙ্গেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় কিছু কিছু জায়গায় সম্প্রতি এই তুলোর চাষ হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের সুভিন তুলোও এই মিহি বুননের উপযুক্ত।

শাড়ি... যার বুননকে পার্থিব নয়, কোনও স্বর্গীয় বুননের সঙ্গে তুলনা করেছেন ইংল্যান্ডের কার্পাস শিল্পের জনক বেইন্স। চওড়ায় ৫০ ইঞ্চি ও ১১ মিটার যে শাড়িকে আবার গলিয়ে দেওয়া যাচ্ছে আংটির মধ্যে দিয়ে। মসলিনের এই শাড়িকে ঘিরে যে কিংবদন্তি হাজার বছর ধরে রয়েছে, সেই সুক্ষ্মতার কিংবদন্তিকে প্রায় সত্যি প্রমাণ করেছেন নবদ্বীপের মাটিয়ারি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের কারিগররা। যাঁরা বহুবছর ধরেই ৫০০ কাউন্ট মসলিন বাণিজ্যিক ভাবে তৈরিতে সক্ষম। সম্প্রতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ৬০০ কাউন্টের অবিশ্বাস্য মিহি মসলিনের সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রতিষ্ঠানের কাটুনি থেকে বুনন শিল্পীদের অসাধারণ শৈল্পিক ক্ষমতা, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা মসলিন হয়ে উঠেছে এ বাংলার নিজস্ব সম্পদ। তাঁদের এই সাফল্যকে সিলমোহর দিতে সচেষ্ট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের খাদি বোর্ড। কিংবদন্তি এই মসলিনের মুকুটে উঠতে চলেছে একটি নতুন পালক, জি আই রেজিস্ট্রেশন। যা প্রায় পেটেন্টের সমতুল্য। শাড়ির ভৌগলিক পরিচিতি ও মান বজায় রাখার উপায়। মসলিনে যখন আবার এসেছে কিংবদন্তির স্পর্শ তখন যন্ত্রচালিত নকল মসলিনের সঙ্গে হাতের দ্বারা সৃষ্টি মসলিনের পার্থক্য বজায় রাখতে এই রেজিস্ট্রেশন একটি অত্যন্ত মূল্যবান পদক্ষেপ।

শিল্পী ও শিল্পের ভবিষ্যৎ

যে শিল্পীদের শিল্পের গুণে তৈরি হয় ঐন্দ্রজালিক বুনন, যাঁদের আঙুলের ডগায় ঈশ্বরের বাস তাঁরা কেমন আছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মেলে ৫০০ কাউন্টের এক মিটার মসলিন তৈরির মজুরির দ্বারা যা প্রায় ১৫৬৫ টাকা। একটা মসলিনের শাড়ি যা বুনতে লাগে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ দিন। সেই পরিশ্রমের মূল্য মোটামুটি ৯০০০-এর কাছাকাছি। এই অসাধারণ সাধনা ও হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফলে সৃষ্ট মাকড়সার জালের মতো মিহি বুননের যে পারিশ্রমিক তা কেবল একটি তাঁতির নয়, সমগ্র পরিবারের। কোভিড পরবর্তীকালে এই অবস্থা আরও শোচনীয়। এই শিল্প তার গায়ে যে দেশভাগের দগদগে দাগ নিয়ে এই বাংলার মাটিতে পুনরায় জন্ম নিয়েছিল, সেই জন্মদাগ তার আজও বিদ্যমান অখণ্ড বাংলায়। এই শাড়ির প্রয়োজনীয় যে তুলো তা ছিল বাংলার নিজস্ব। ঢাকার আশপাশের অখণ্ড বাংলার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মাত, সেই তুলো। দেশভাগের পর এপার বাংলায় কিছু অঞ্চলে এই তুলোর চাষ হলেও তা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। দক্ষিণ ভারত থেকে এই তুলো আমদানির জন্য সুতোর দাম অন্য শাড়ির চেয়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড পরবর্তীকালে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমায়, চাহিদা কমেছে এই বহুমূল্য শাড়ির। ফলে ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা ত্যাগ করে একশো দিনের মজুরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তবুও সরকারি প্রচেষ্টা খানিক হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার থেকে চরকা প্রদান, সুতো কাটা, তাঁত বোনার ঘর তৈরি করা ও সরকারি বিভিন্ন কেন্দ্রে বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে। যার ফলে খানিক হলেও মসলিনের বিদেশে রফতানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবেই হয়তো সুদূর কোনও ভবিষ্যতে বাংলার মসলিনের খোঁজে এপার বাংলায় নোঙর ফেলবে বিদেশি জাহাজ, আরও একবার মুগ্ধ হবে বিশ্ব তার মিহি বুননে। সেই সুদূর কোনও সোনালি ভবিষ্যতেই সারবে ছিন্নমূল এই শাড়ির কাঁটাতারের ক্ষত, যন্ত্রণা।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ ও ইন্টারনেট



ঐন্দ্রজালিক বুনন

মডেল: অনন্যা
মেক-আপ: নবীন দাস,
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
স্টাইলিং: তন্ময় বিশ্বাস,
ফোন: ৯৮৭৪৬৫০৮৬৯
শাড়ি: অর্চিষা বুটিক
ফোন: ৮১০০২৯৮৫৪৭
ছবি: সোমনাথ রায়

অথ পটচিত্র কথা



'বাংলার সৃষ্টি, বাংলার কৃষ্টি'—এই ভাবধারার এক উজ্জ্বল উপাখ্যান বাংলার পটচিত্র। তুলির রংয়ের সঙ্গে মনের রং মিশিয়ে বাংলা দেখাল চিত্রশিল্পের এক নতুন দিগন্ত। স্থিরচিত্রের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন জায়গায় শুরু হল রং-তুলির এক নতুন অভিযান। শুধুই চিত্রকরের ফ্রেম নয়। শাড়ির ভাঁজেও ফুটে উঠল তুলির টান। পটচিত্রের সেই ঐতিহ্য ও শাড়ির ইতিহাস তুলে ধরলেন অনিকেত গুহ।

গাছি তসরের উপর পটচিত্র আঁকা শাড়ি

বাংলার পটচিত্র ভারতের অন্যতম একটি প্রাচীন আর্টফর্ম। বাংলার কিছু সীমাবদ্ধ অঞ্চলে জন্ম নেওয়া এই শিল্প মুঘল শাসন থেকে 'বাবু-কালচার', দাঙ্গা থেকে দুর্ভিক্ষ তথা বাংলার বিবর্তনের সাক্ষী। কলকাতার কালীঘাট ও মেদিনীপুরের পিংলা পটশিল্পের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে যুগ যুগ ধরে। শাড়িতে পটচিত্রের ছোঁয়া লাগে শহুরে ও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে। কালীঘাটের পটুয়ারা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসে। সেসময়ে কলকাতার মানচিত্রে ধীরে ধীরে জায়গা করছে বাবু-কালচার। এই মিশ্র সংস্কৃতিকে বাহন করেই অঙ্কুরিত হল 'কালীঘাটের পট'। ব্যঙ্গচিত্র, রম্য-রসিকতা, সামাজিক নিয়ম বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট— সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে পটচিত্রের পরিসর। একদিকে সাহেবিয়ানা অন্যদিকে বদলে যাওয়া পরিস্থিতি— কৃষ্টির বিবিধ ধারার সমবেত আত্মপ্রকাশ ঘটল পটচিত্রের মধ্য দিয়ে। ফলে পটচিত্র হয়ে উঠল অবাধ, আনকোরা ও সৃজনশীল।


বাবু-কালচার: কালীঘাটের পট

পটের চিত্রণ

পটে আঁকার ধরন ও পট তৈরির পদ্ধতি নিয়ে ইতিহাসে গবেষণা হয়েছে বিস্তর। এই বিষয়ে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় আঞ্চলিক বিবিধতা দেখা যায়। পটশিল্পের তুলি তৈরি হয় কাঠবেড়ালি ও ছাগলের রোম থেকে। অতিসূক্ষ্ম কাজের জন্য এই ধরনের তুলির ব্যবহার হত। রং তৈরির পদ্ধতিও ছিল ঘরোয়া। একটি পাত্রকে আগুনে পুড়িয়ে তৈরি করা হত ভুসোকালি যা পটচিত্রে কালো রংয়ের উৎস। লাল, নীল, হলুদ বা অন্যান্য উজ্জ্বল রং তৈরির ক্ষেত্রেও ফুল, শাক অথবা গাছের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার দেখা যায়। তেল বা আঠা রংয়ের সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে আঁকা হত পটের উপর। ফুটে উঠত বঙ্গ সমাজের হাল-হকিকত।

আঠারো শতকের শেষ বা উনিশ শতকের গোড়ায় পটচিত্রের জৌলুস বাড়তে থাকে। জন্ম লগ্নে বাংলার পট ছিল ঔপনিবেশিক আভিজাত্যের বাইরে। সাধারণ সুতির কাপড় বা স্ক্রোলের উপর সযত্নে ফুটে উঠত পটের নকশা। পরিবারের সকলের হাতের ছোঁয়ায় সম্পূর্ণ হত এক-একটি পট। আট থেকে আশি সকলেই শিল্পী—পটচিত্রের এই ঘরানা বাংলার স্বকীয়তার প্রতীক। পরিবারের মহিলা ও ছোটরা প্রধানত রং বা তুলি তৈরির কাজ করতেন।


মাছের পট: পিংলা, মেদিনীপুর



নয়াগ্রামের পটচিত্র

নগরজীবন থেকে গ্রাম্য-গাঁথা, পৌরাণিক চরিত্র থেকে লোকায়ত সংস্কৃতি— পটচিত্রের বিচরণ সর্বত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনেও পটুয়াদের শিল্পীসত্তার প্রকাশ নিরবচ্ছিন্ন থেকেছে যুগ যুগ ধরে।

অনেকসময়ে মহিলারা পট চিত্রণের আগে আউটলাইন বা আঁকার বেস-লাইন তৈরি করে রাখতেন। প্রথমে সম্পূর্ণ আঁকার স্কেচ তোলা হয়। দ্বিতীয় ধাপে রং প্রয়োগে ফুটিয়ে তোলা হয় হিউম্যান ফিগার বা মানুষের প্রতিকৃতি। শেষ ধাপে কালো আউটলাইন, ব্যাকগ্রাউন্ড ও মোটিফ সহ সম্পূর্ণ পটে রং করা হয়। এভাবে 'উৎসবে ব্যসনে' পটচিত্র হয়ে উঠে সমাজ ও শিল্পের দর্পণ। শিল্পসত্তা প্রকাশের হুজুগে জন্ম নেওয়া পটচিত্র ধীরে-ধীরে হয়ে উঠল পরিবারের সহায় সম্বল। পরিবারের নারী ও পুরুষ কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে কাজে অংশ নিতেন। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানাধিকারের প্রথম দরজা খোলে সম্ভবত পটশিল্পের হাত ধরে।

বাংলার পটের প্রকার: পিংলা বনাম কালীঘাট

বাংলার পটের উত্থান ও বিবর্তনের ইতিহাস দীর্ঘ। সংস্কৃত শব্দ 'পট্ট' (যার অর্থ কাপড়) ও 'চিত্র'(যার অর্থ ছবি) থেকে এসেছে পটচিত্রের ধারণা। স্থানের বিভিন্নতা ও চিত্রণের তারতম্য পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্রকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। কলকাতার কালীঘাট ও মেদিনীপুরের পিংলা বাংলার পটচিত্রের পীঠস্থান। বলা বাহুল্য, দু'জায়গার পটের বিষয়-আশয় অনেকাংশেই আলাদা। কালীঘাটের পটে প্রধানত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভাব বারবার ফিরে এসেছে। প্রাচ্য ভাবধারায় বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবী, পৌরাণিক চরিত্র, লোকগাথা বা লোকগানের বর্ণনা, স্থানীয় কিংবদন্তি বিশেষভাবে দেখা যায়। লোকায়ত কিছু দেব-দেবী যেমন- অন্নপূর্ণা, মনসা, রাধাবিরহ, শিব-সতী এঁদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অন্যদিকে এক ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে পাশ্চাত্য ভাবধারার পটচিত্রের বিষয়শৈলী। এক্ষেত্রে সমকালীন সমাজ-জীবনের ছাপ অনেক বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক অপরাধ, সামাজিক নিয়মনীতি, ব্রিটিশ শাসনকালে সমাজে নারী ও পুরুষের পরিবর্তিত অবস্থান, নারীশিক্ষার প্রসার, উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা 'বাবু কালচার', বাঈজি ও নর্তকী প্রথার বাড়বাড়ন্ত ইত্যাদি সামাজিক ঘটনা উনিশ-শতক-পরবর্তী সময়ে প্রধান হয়ে উঠে। কলকাতার কালীঘাট ছাড়িয়ে এবার আসা যাক মেদিনীপুরের পিংলায়। কালীঘাটের শহুরে ছোঁয়া এখানে বদলেছে গ্রামীণ সরল লৌকিক জীবনযাত্রায়। পটেও হয়েছে পরিবর্তন। লোকায়ত চরিত্র এখানে পটুয়াদের কাছে অনেক বেশি আপন হয়ে উঠেছে। রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গলের চিরায়ত কাহিনি এই পটের মূল উপজীব্য। রাজা হরিশচন্দ্র, কবিয়ালদের জীবন, বাউল আখড়ার কথা— পটুয়াদের তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠে গ্রাম্য জীবন। যুগ যুগ ধরে এভাবেই পিংলার পটুয়ারা বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের পটশিল্পের ধারা। আকারের ভিত্তিতে পিংলার পট মূলত তিন প্রকার। জড়ানো বা গোটানো পট, আড়ে-লাটাই পট ও চৌকো পট। জড়ানো পট অনেকটা সিনেমার রিলের মতো। লোকগাঁথা বা পোরাণিক কোনও কাহিনী ধারাবাহিকভাবে আঁকা হয়। এই পটচিত্রের ছবি দেখিয়েই পটুয়ারা গ্রামে ঘুরে-ঘুরে গান গাইতেন। এই সুপ্রাচীন প্রথা মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত কিছু গ্রামে আজও দেখা যায়। আড়ে-লাটাই পটের আকার অনেকটা scroll সদৃশ। ছবির ফ্রেমের মতো দেখতে পটগুলি চৌকো পট নামে পরিচিত। পিংলার এই পট আকারে কালীঘাটের পটের তুলনায় খানিক

ছোট। পটচিত্রের রং সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক। পটুয়ারা ঘরোয়া পদ্ধতিতে প্রস্তুত করেন শুকনো রং। এই রং-এ বেলের আঠা মিশিয়ে পটচিত্রের ব্যবহার করা হয়। পিংলা অঞ্চলের কাছেই রয়েছে আরও একটি গ্রাম 'নয়া'। পিংলার মতো এই গ্রামেও পটুয়াদের বসবাস। মূল ধারার পটচিত্রের বাইরে মানুষের আবেগ-অনুভূতির ছোঁয়া দেখা যায় এই পটের উপস্থাপনায়। পিংলার শিল্পীরা বছরভর ব্যস্ত থাকেন পট আঁকায়। বাজারে চাহিদার জোয়ার আসে পুজোর মুখে। কলকাতা ও হাওড়ার একাধিক জায়গা থেকে আসে পুজোর কাজের বরাত। তখন পরিবারের সকলে একসঙ্গে নেমে পড়েন শাড়িতে নকশা তোলার কাজে। সুতির পাশাপাশি সিল্কের শাড়ির উপর ফুটে উঠে রঙিন নকশার মায়াজাল। একটি শাড়ি তৈরিতে সময় লাগে প্রায় সাত দিন। পুজোর আগেই শহর ও শহরতলির শাড়ির বাজার ভরে উঠে পটচিত্রের জৌলুসে।


কালীঘাটের পট

তুমি কি কেবলই ছবি?

সময় বহমান। ঔপনিবেশিক ভাবধারার আদিলগ্নে বঙ্গ সমাজের এক ব্যতিক্রমী শিল্পসত্ত্বার প্রকাশ ঘটেছিল পটচিত্রে। মিশরীয় সভ্যতায় বহু প্রাচীন scroll paintings পাওয়া গিয়েছে যাদের সঙ্গে মেদিনীপুর বা পুরুলিয়ার পটচিত্রের সহজ তুলনা চলে। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চৈতন্য লীলার ঢেউ আছড়ে পড়ল বাংলা জুড়ে। প্রেম-অনুরাগ-বিরাগ ছড়িয়ে পড়ল পটশিল্পের কোণায় কোণায়। বীরভূম, বর্ধমানের এই বিশেষ পট 'যমপট' নামে পরিচিত। পটচিত্রের শেষভাগে যমরাজের উপস্থিতি এই নামের সম্ভাব্য কারণ। বাংলায় তুর্কি আক্রমণের পর পটচিত্রে আসে রূপান্তর। চৈতন্য যুগের পরবর্তি সময়ে পট-পরম্পরায় ঘটে মুসলিম ভাস্কর্যের অনুপ্রবেশ। জন্ম নেয় 'গাজী'র পট'। 'গাজী' অর্থাৎ ধর্মযোদ্ধা ও তার বীরত্বের কাহিনী। দক্ষিণবঙ্গে বাঘের উপর আসীন গাজীর পটের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে বাংলা জুড়ে। ধর্মীয় সংকরায়ণে সৃষ্টি হয় 'সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পট'। আজও বাংলার ঘরে ঘরে পূজিত হন সত্যপীর। শুধুই ধর্মীয় ভাবাবেগ নয়; দিনবদলের কলতানে মুখর বাংলার পটশিল্পের ইতিহাস। সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের উপর তৈরি পটচিত্রের সংখ্যা নেহাত কম নয়। আজও মেদিনীপুর, পুরুলিয়ায় গেলে যে কেউ 'বীরসা ভগবানের পট' খুঁজে পাবেন। বাংলার পটচিত্র শুধুই তুলির সঙ্গতে সৃষ্ট ছবি নয়; সমাজ-সভ্যতার উত্তরণের এক উল্লেখযোগ্য দলিল।


শাড়িতে পটচিত্র

পটচিত্রের সাম্প্রতিক প্রকাশ দেখা যায় বাংলার শাড়িতে। শাড়ি জুড়ে দেখা যায় বিভিন্ন লৌকিক বা পৌরাণিক নকশা। তাঁত, সিল্ক, হ্যান্ডলুম সবধরনের শাড়িতেই পটচিত্রের সমান আধিপত্য। বাংলার বিভিন্ন ধারার ফ্যাবরিকের জন্ম পটচিত্রের হাত ধরেই। কোভিড পরবর্তী সময়ে পটুয়াদের সার্বিক অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। বহু পটুয়া পেটের টানে পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন। গ্রামীণ বস্ত্রবয়ন ও কুটীরশিল্পে সরকারি সাহায্য আশার আলো দেখাচ্ছে পটশিল্পে। সুপ্রাচীন এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুধুই সরকারি সাহায্য নয়; প্রয়োজন পটশিল্পের অতীত-গৌরবের উজ্জ্বল আগুনে হাত রেখে আগামীর অঙ্গীকার!


আঁচলের নকশা

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ

মডেল: শ্রীময়ী, **মেক-আপ:** বাবুসোনা সাহা, **ফোন:** ৮২৪০৫৫০৮৮৪, **স্টাইলিং:** অয়ন হোরে, **ফোন:** ৯০০৭২২০৪৯৬, **শাড়ি:** পূরবী বুটিক **ফোন:** ৯৩২৩৭৬৯৬৬,**গয়না:** করিশ্মাজ়, **ছবি:** সোমনাথ রায়

এই বাংলার শাড়ি

ব্লক প্রিন্টের বিবর্তন

জন্ম চিনে, প্রসার ভারতে। আপাতত দেশের অন্যান্য প্রান্তের ব্লক প্রিন্টের জনপ্রিয়তা সার্বিকভাবে বেশি হলেও, বৈচিত্রে, ঐতিহ্যে বাংলার ব্লক প্রিন্ট সেসবের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। লিখছেন সায়নী দাশশর্মা।



ছোট ছোট কাঠের টুকরোর উপর খোদাই করা নকশা, তাতে রং লাগিয়ে কাপড়ের উপর চেপে ধরে সেই ছাপ ফুটিয়ে তোলা... এরই পোশাকি নাম ব্লক প্রিন্ট। বাংলায় উৎস না হয়েও যা আজ বাঙালি হস্তশিল্পের অন্যতম অঙ্গে পরিণত হয়েছে। কোনও 'রিপিট' মার্ক না রেখেই প্রতিটা ব্লক ধরে ধরে শাড়িতে তার ছাপ ফেলা, নিতান্তই সহজ কাজ নয়। সময়সাপেক্ষ তো বটেই, আবার পরিশ্রমসাধ্যও। সেই কারণে এখন বেশিরভাগ অঞ্চলেই মেশিন ব্লক প্রিন্টের চল বেড়েছে। তবে বাংলা-সহ দেশের বেশ কিছু অংশে এখনও পুরনো পদ্ধতি মেনেই ব্লক প্রিন্ট করা হয়। তাঁদের হাতের ছোঁয়াতেই আজও বেঁচে রয়েছে ব্লক প্রিন্টের চিরন্তন কৌশল।

শোনা যায়, আজ থেকে প্রায় ৪০০০ বছর আগে চিনে প্রথম এই ধরনের ছাপার প্রচলন শুরু হয়। সিল্কের উপর কাঠের ব্লকের সাহায্যে তাঁরা মূলত অক্ষর ছাপাতেন। মাত্র তিনটি রঙের ব্যবহার হত তখন। ধীরে ধীরে তাতে ফুল, লতা, পাতার মোটিফ দেখা যেতে থাকে। এরপর হানদের রাজত্বকালে চিনে ব্লক শিল্পের প্রসার ঘটে। ক্রমশ তার প্রবেশ ঘটে ভারতে। সিন্ধু সভ্যতাতেও ব্লক প্রিন্টের প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়। তবে ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ, অর্থাৎ মোঘলদের শাসনকালে ব্লক প্রিন্ট শিল্প অন্য মাত্রায় পৌঁছয়। সম্রাট শাহজাহানের সময়ে যে সকল শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল ভারতে, ব্লক প্রিন্ট তার মধ্যে অন্যতম। মোঘলদের সূত্র ধরেই ফুল-পাতার মোটিফের সঙ্গে বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশারও প্রচলন শুরু হয় ব্লক প্রিন্টে। এদেশে প্রথম ব্লক প্রিন্টিং সেন্টার হয়ে ওঠে গুজরাত ও রাজস্থান। এরপর ব্রিটিশদের আগমন ঘটে ভারতে। দেশ থেকে তাঁরা বিভিন্ন জিনিস বিদেশে রপ্তানি করতেন। এভাবেই ক্রমশ দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে ব্লক প্রিন্ট। ততদিনে তিন রঙের সীমিত পরিসর ছেড়ে এই শিল্প পুরোদস্তুর রঙিন হয়ে উঠেছে। বাংলায় এই শিল্পের প্রচলন ঘটে ১৯৪০ সাল নাগাদ। স্থানীয় শিল্প না হওয়া সত্ত্বেও হুগলির শ্রীরামপুর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ব্লক প্রিন্টের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে বর্ধমানেও ব্লক প্রিন্টের বিকাশ ঘটে। সুদক্ষ, স্থানীয় শিল্পীরা দ্রুত এই শিল্পে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তবে ব্লক





চলছে রং ভরার কাজ



ব্লক খোদাই



বাংলায় এই শিল্পের প্রচলন ঘটে ১৯৪০ সাল নাগাদ। স্থানীয় শিল্প না হওয়া সত্ত্বেও হুগলির শ্রীরমপুর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ব্লক প্রিন্টের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে বর্ধমানেও ব্লক প্রিন্টের বিকাশ ঘটে।

প্রিন্টের কৌশল রপ্ত করলেও, তাঁরা প্রচলিত মোটিফ বা নকশার হুবুহু অনুকরণ করার পরিবর্তে নিজেদের সৃজনশীলতা, তথা শৈল্পিক জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে শুরু করেন নকশায়। ব্লক প্রিন্ট শিল্পে আজ বাংলা যে নিজস্ব জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, তার পুরো কৃতিত্বই তৎকালীন শিল্পীদের।

মূলত শিশু গাছের কাঠ দিয়ে ব্লক তৈরি করে তাতে বিভিন্ন ধরনের নকশা খোদাই করা হয়। তবে এর জন্য দক্ষ কারিগর প্রয়োজন। কারণ, ব্লকই এই প্রিন্টের প্রধান উপকরণ। ব্লকের নকশা নিঁখুত এবং সুন্দর নাহলে, ছাপাও ভাল হয় না। আর ব্লক তৈরি করাও বেশ সময়সাপেক্ষ। নকশা-বিশেষে প্রায় ১৫ দিনও লেগে যেতে পারে এক-একটি ব্লক তৈরি করতে। কাগজে আঁকা নকশা কার্বন পেপারের সাহায্যে কাঠের ব্লকে ছাপ তুলে তারপর নিপুণ হাতে খোদাই করা হয়। তারপর বেশ কিছু সময় সরষের তেলে ডুবিয়ে রাখা হয় সেই ব্লক। সুতি, সিল্ক, মসলিন, ইত্যাদি সব ধরনের ফ্যাব্রিকেই ব্লক প্রিন্ট করা যায়। তবে খুব পাতলা ফ্যাব্রিক ব্যবহার করা হয় না, কারণ ছাপার পর রং পাকা করতে তাপের ব্যবহার হয় অনেকসময়। ছোট ছোট ব্লক ব্যবহার করা হয় বলে, কোনও 'রিপিট' মার্ক যেন না পড়ে, তা খেয়াল রাখতে হয়। যে কাপড় ছাপা হবে, তা অন্য কোনও সাদা কাপড়ের উপর টানটান করে বিছিয়ে নেওয়া হয়, যাতে ছাপার সময় অন্য কাপড় থেকে রং উঠে না আসে। এরপর এক বা একাধিক রং মিশিয়ে তাতে ব্লক ডুবিয়ে শাড়ির উপর ছাপ ফেলা হয়। যদি নকশায় একাধিক রঙের ব্যবহার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে একটি ছাপার উপর অন্য রং দিয়ে আবার ছাপ ফেলা হয়। এরপর রোদে কাপড় শুকিয়ে তাপ দিয়ে রং পাকা করে নেওয়া হয়। কেমিক্যাল এবং প্রাকৃতিক, দু'রকম রংই ব্যবহার হয়। তবে প্রাকৃতির রঙের উপকার বেশি হলেও খরচও অনেকটাই বেশি।

ছাপা দীর্ঘদিন ভাল রাখতে এবং রং উজ্জ্বল রাখতে বিশেষ যত্ন নিতে বলা হয়। ক্ষারযুক্ত ডিটারজেন্টের ব্যবহারে বা সরাসরি সূর্যের আলোয় রঙের উজ্জ্বলতা কমে আসে সহজেই। তাই মাইল্ড সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে হাওয়ায়, মিয়ানো আলোয় কাপড় শুকোতে হয়। বিশেষত যদি কাপড়ের জমি গাঢ় রং এবং তার উপর উজ্জ্বল রঙের ছাপা থাকে, সেক্ষেত্রে তার প্রতি আরও বেশি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তবে ব্লক শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বললে হয়তো অত্যুক্তিই হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং মেশিন প্রিন্টের ভিড়ে ক্রমশ মলিন হয়ে আসছে বাংলার এই হস্তশিল্প। অতিমারির আঘাত সামলে নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা নিজের মতো করে এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন, সেটাই আশার আলো। আধুনিক নকশা, নতুন ধরনের চিন্তাভাবনার প্রকাশে এই শিল্পের নবজাগরণ সম্ভব কিনা, তা যদিও সময়ই বলবে...

মডেল: রিয়া, শ্রীলগ্না, তনুশ্রী, **মেক-আপ:** নবীন দাস,
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮, **স্টাইলিং:** নীল সাহা,
ফোন: ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩, **শাড়ি:** বিবিধ, **ফোন:** ৯৮৩১১৮৬১৪৯,
গয়না: আঁকিবুকি অদিতি, **ফোন:** ৯৭৪৮৪৬১১০৫
ছবি: সোমনাথ রায়

বৈচিত্র্যের বাটিক

কাপড়ের উপর মোম দিয়ে এঁকে রঙে ডুবিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় বিভিন্ন মোটিফ, নকশা। উৎস বঙ্গে না হলেও, বাটিকশিল্পের অস্তিত্ব ধরে রাখায় বাংলার ভূমিকাও কম নয়। লিখছেন সায়নী দাশশর্মা।

বাঙালি, অথচ 'বাটিক' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নন, এমন মানুষ পাওয়া বিরল। টেক্সটাইল, প্রিন্ট সম্পর্কে একেবারে ওয়াকিবহাল নন, এমন কাউকেও যদি কয়েকটি পদ্ধতির নাম জিজ্ঞেস করেন, নিঃসন্দেহে বাটিকের প্রসঙ্গ উঠবেই! কারণ বাড়িতে মা-কাকিমা-দিদিমাদের কখনও না কখনও বাটিকের শাড়িতে প্রত্যেকেই দেখেছেন, নিজেরাও পরেছেন বাটিকের বিভিন্ন পোশাক। একটা সময় ছিল, যখন পয়লা বৈশাখের বাজারে বাটিকের একচেটিয়া অধিকার ছিল। তখনও সিল্কে বাটিকের চল সেভাবে হয়নি। সুতির কাপড়ে অস্পষ্ট, মোটা রেখা আর বিন্দুতে ফুল, পাতা, আলপনার নকশার সঙ্গে সেই থেকেই কোথাও যেন বাঙালিয়ানা জড়িয়ে গিয়েছে। যদিও এর উৎস বাংলায় নয়। ইতিহাস বলে, প্রায় ২০০০ বছর পুরনো এই পদ্ধতির উৎপত্তি মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। যদিও প্রায় একই সময়ে আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যেও এর অস্তিত্বের সন্ধান মেলে। 'বাটিক' শব্দটির উৎপত্তি ইন্দোনেশীয় শব্দ 'আম্বাটিক' থেকে, যা জাভানিজ় শব্দ 'আম্বা' এবং 'টিটিক' থেকে এসেছে। আক্ষরিক অর্থে যার মানে বিন্দু দিয়ে লেখা। কাপড়ে নানা রঙের বিন্দু, মোটা রেখা দিয়ে আঁকা বিভিন্ন নকশাকেই 'বাটিক' বলে চিনি আমরা। মূলত এক ধরনের রেজ়িস্ট্যান্ট ডাইং টেকনিক বাটিক। অর্থাৎ, কাপড়ের উপর মোম দিয়ে রেজ়িস্ট্যান্স তৈরি করে তার উপর রঙের ব্যবহার হয়। এখন বাটিকের সার্বিক জনপ্রিয়তা এবং চাহিদা বাড়ার কারণে হ্যান্ড বাটিকের পাশাপাশি ব্লক বাটিকেরও চল হয়েছে। যদিও দুয়ের পদ্ধতি অনেকাংশেই এক। হ্যান্ড বাটিকের ক্ষেত্রে প্রথমে কাগজে নকশা এঁকে নেওয়া হয়। এরপর টেবলের উপর কাপড় টানটান করে রেখে সেই ডিজ়াইন কাপড়ে ট্রেস করা হয়। এরপর নকশার উপর পুরু করে গরম মোমের প্রলেপ পড়ে। যে টেবলে এটি করা হয়, তার তাপমাত্রা যাতে বেশি না হয়, তার জন্য ব্যবহার করা হয় বালি এবং জল। মোম ঠান্ডা হলে অল্প অল্প চিড় ধরে তাতে। এরপর পুরো কাপড় জুড়ে রং করা হয়। মোমের চিড় দিয়ে রং প্রবেশ করলেও, মোমে ঢাকা অংশ ফাঁকা থাকে। রং শুকিয়ে গেলে হয় মোম কাচিয়ে নেওয়া হয়, নাহলে কাপড় গরম জলে ডুবিয়ে রাখা হয়, যাতে সব মোম গলে যায়। যত সংখ্যক রং ব্যবহার করা হয়, ততবার এই একই পদ্ধতি রিপিট করা হয়। নকশা অনুযায়ী মোম ব্যবহার এবং রং করার ধরন বদলায়। ইন্দোনেশীয় বাটিকে যেমন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট মোটিফই বেশি চোখে পড়ে বলে বেশিরভাগ সময়ই সেখানে 'স্প্ল্যাশ' পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। অন্যদিকে, বাংলার বাটিকে আলপনা, ফুল, পাতা, লোকচিত্রকথা ফুটিয়ে তুলতে হাতে আঁকা নকশার ব্যবহার হয়। গরম মোম সরাসরি কাপড়ে ফেলা হয় বলে, সব রকম ফ্যাব্রিকে বাটিকের ব্যবহার করা যায় না। এমন ফ্যাব্রিকই বাছা হয়, যা গরম মোমের তাপে নষ্ট হয় না (মূলত সিল্ক আর সুতির কাপড়)। ট্র্যাডিশনাল বাটিকে চাল থেকে পাওয়া স্টার্চ আর মোম ব্যবহারের কথাই শোনা যায়। প্রিন্ট বাটিক বা ব্লক বাটিকের ক্ষেত্রে এই সবটাই করা হয়, শুধু হাতে আঁকা নকশার বদলে কাঠের ব্লকে নকশা খোদাই করে তাতে মোম লাগিয়ে তা ব্যবহার করা হয়। ফলে সময়ও অপেক্ষাকৃতভাবে কম লাগে।

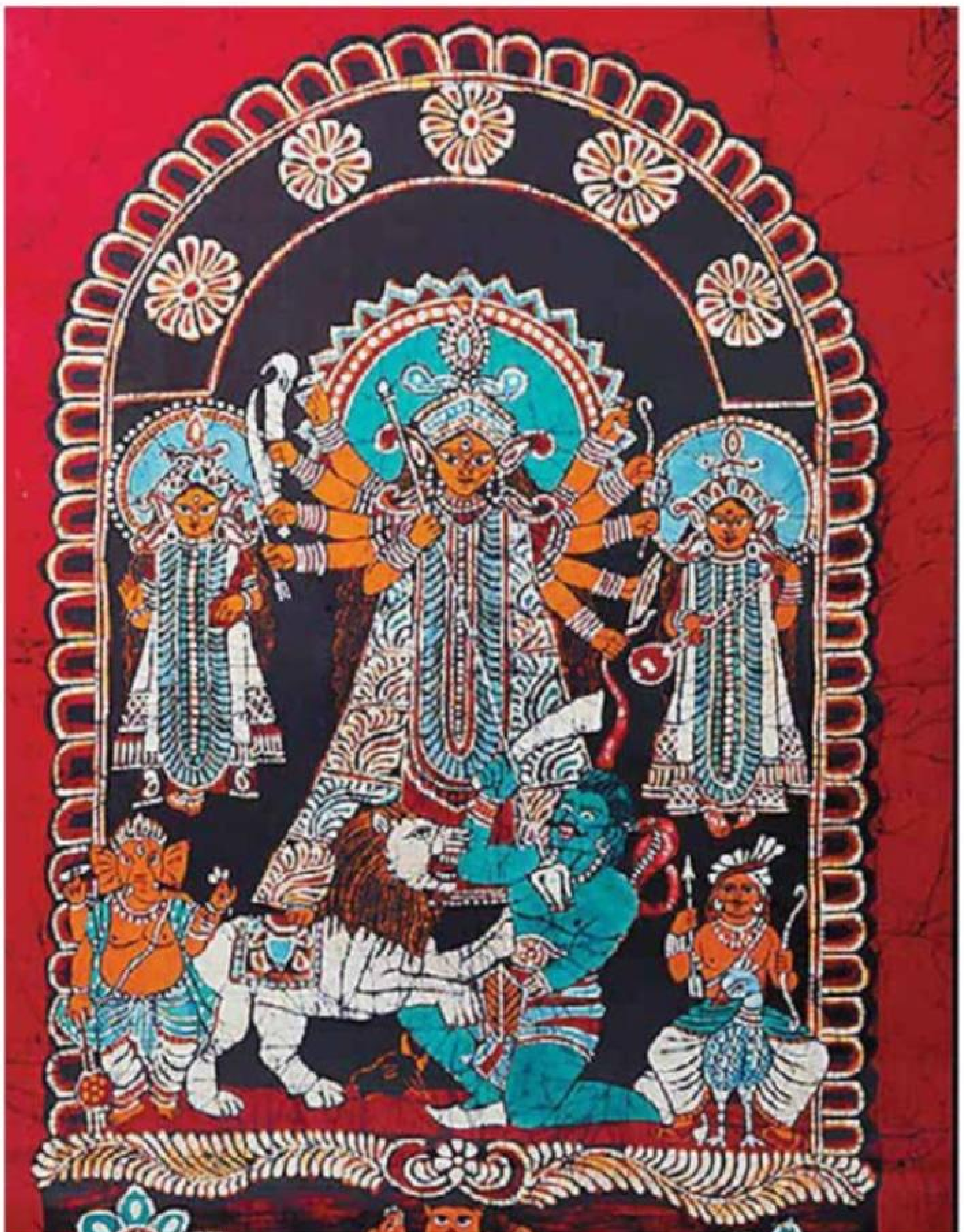
সতেরো শতাব্দীতে যখন চিন, ইন্দোনেশিয়ার নানা দ্বীপ এবং পারস্যের মধ্যে স্থলপথে সংযোগ স্থাপিত হয়, সেই থেকেই ধীরে ধীরে বাটিক ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের নানা অংশে। বাংলায় বাটিকের আগমনও সেখান থেকেই। যদিও কালের গর্ভে এক সময় প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছিল এই পদ্ধতি। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে তা নবজন্ম পায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে কবিগুরু জাভা দ্বীপে এই কৌশল দেখে অভিভূত হন। দেশে ফেরার সময় সঙ্গে করে কিছু বাটিকের ফ্যাব্রিক নিয়ে আসেন। তাঁর সূত্র ধরেই বাংলায় আবার জনপ্রিয়তা ফিরে পায় বাটিক। বিশ্বভারতীতে এর উপরে কোর্স প্রচলিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পী, কারিগরদের হাতের গুণে নতুন রূপ পায়



লাইল্যাক রঙের জমিতে গাঢ় নীলে বাটিক প্রিন্ট। চিরন্তন 'ফাটা' বাটিকের সঙ্গে আলপনার অ্যারেঞ্জমেন্ট।

ফুলের নকশা, অজন্তার চিত্রকলা। ক্রমশ রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে দেশের নানা প্রান্তেও পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে এই শতাব্দীপ্রাচীন শিল্প। এক সময় শান্তিনিকেতনের হাত ধরে যে বাটিক পরিচিতির আলোয় উঠে এসেছিল, এখনও সেই কৌশল, সেই নকশাই নানাভাবে ব্যবহার করা হয়ে আসছে বাটিকশিল্পে। আর তাই দেশ তথা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নকশার কৌশল, আলপনার ধরন নিত্য বদলালেও, বাংলার বাটিকশিল্পে শান্তিকেতনের নাম চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে আজীবন।

মডেল: তনুশ্রী, শ্রীলগ্না, পূজা
মেক-আপ: নবীন দাস, **ফোন:** ৯৮৩১২৩৩৬১৮
স্টাইলিং: নীল সাহা, **ফোন:** ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩
শাড়ি: কুনবি, হিন্দুস্থান পার্ক, **ফোন:** ৯১৬৩৪৫৫৫০০



বাটিকে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া

পিন্টু হালদার, টেক্সটাইল ডিজ়াইনার, বাবুই

বাংলার বিভিন্ন ডাই করার কৌশল এবং ব্লক প্রিন্ট নিয়ে কাজ করছি আমি। বাটিক তার মধ্যে অন্যতম। আমি মূলত 'মাড বাটিক' করি। এতে মোমের পরিবর্তে রেজ়িস্ট্যান্স হিসেবে মাটির ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ব্লক বাটিক নিয়েও কাজ করছি। এমনিতে বাটিকে কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক, দুরকম রংই ব্যবহার করা হত। তবে আমি প্রাকৃতিক রং নিয়েই কাজ করছি। কারণ এই ডাই থেকে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই, পরিবেশের পক্ষেও ভাল। কাজ করতে করতেই বুঝেছি, ক্রমশ এই ধরনের শিল্পের প্রতি লোকের উৎসাহ কমছে। কারণ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নকশা, ডিজ়াইন, প্যাটার্ন বদলাচ্ছে না। একশো বছর আগে যে ধরনের নকশা, আলপনা লোকে পছন্দ করতেন, এখন অনেকের কাছেই সেগুলো পুরনো, একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। নতুন কিছু চাইছেন সকলে। সেই কারণেই আমি চিরন্তন বাটিকের নকশার সঙ্গে মডার্ন ডিজ়াইন, প্যাটার্নের সংমিশ্রণ করে বাটিককে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমার বিশ্বাস, নতুন ধরনের কনসেপ্ট বা ডিজ়াইন পেলে, বাটিকশিল্পের চাহিদা আবারও বাড়বে।

বাটিক। সেসময় প্রথম বাটিক নিয়ে কাজ করেছিলেন আঁদ্রে কারপেলেস নামক এক ফরাসি শিল্পী। বিশ্বভারতীর তৎকালীন শিক্ষক ছিলেন তিনি। কবিগুরুর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকেও বাটিক তৈরির পদ্ধতি শেখান তিনি। পরবর্তীকালে শিল্পী সুরেন কর, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এবং ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন বাটিক নিয়ে আরও নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা করে আজকের রূপ দেন তাকে। এরপর শিল্পী নন্দলাল বসুর সময় শন্তিনিকেতনে আরও প্রসার ঘটে বাটিক শিল্পের। সেই থেকে ইন্দোনেশিয়ার কারুকার্য, নকশা ছেড়ে কাপড়ে ফুটে উঠতে শুরু করে বাংলার আলপনা, লোককথা,



সরষে হলুদ আর কালোর জুটিতে সিল্ক বাটিক। কুচি, পাড় এবং আঁচলে নানা রঙে ফুল-পাতার নকশায় টেম্পল ডিজ়াইন।



এই বাংলার শাড়ি

বিষ্ণুপুর-বৃত্তান্ত

বিষ্ণুপুরি সিল্কের বৈশিষ্ট্য কী? কীভাবেই বা তা তৈরি হয়? বিশেষজ্ঞদের থেকে জেনে নিলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

বাংলার শাড়ি-শিল্পের আঁতুড়ঘরে যে সব বারো-হাতি জাদু তৈরি হয়েছে এতকাল, বিষ্ণুপুরি সিল্ক বরাবরই তার মধ্যে উপরের সারিতে। নরম, মোলায়েম এই শাড়ি বাতাসের মতো ঘিরে রাখে শরীরকে। শাড়ি নিয়ে যাঁরা জানেন, তাঁদের মতে 'সোবার লুক' যদি কেউ চান, তার জন্য বিষ্ণুপুরি সিল্কের জুড়ি মেলা ভার! অনেকে বলেন, বিষ্ণুপুরি সিল্কে মুর্শিদাবাদ সিল্কের চেয়ে সিল্কের অনুপাত বেশি থাকে। এই তথ্য অবশ্য তর্ক ও গবেষণাসাপেক্ষ। কিন্তু বিষ্ণুপুরি সিল্কের মোলায়েম ফ্যাব্রিক এবং সিম্পল কিন্তু আকর্ষক ডিজ়াইন নিয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নেই!

'বিষ্ণুপুরি সিল্ক' বলতে অনেকেই বালুচরি শাড়ি বোঝেন ঠিকই। কিন্তু বালুচরির উদ্ভব আসলে মুর্শিদাবাদে। বিষ্ণুপুরের নিজস্ব শিল্প তা নয়। বিষ্ণুপুর সিল্ক নিয়ে কাজ করেন তাঁতশিল্পী দেবাশিস দে। জানালেন, বিষ্ণুপুর সিল্ক আদতে বিষ্ণুপুরে তৈরি হয় না। বিষ্ণুপুর থেকে কিছু দূরে, সোনামুখিতে। এক জনপ্রিয় শাড়ি বিপণির প্রোপ্রাইটর কবিতা সামসুখার মতে, বিষ্ণুপুর সিল্ক যেমন নরম, তেমনই হালকা। ''একদম পিওর সিল্কের ফিল পাওয়া যায় এই শাড়ি পরলে।

বালুচরিতে যেমন ইলোবরেট কাজ থাকে, বিষ্ণুপুর সিল্কে কিন্তু তা নয়। হয় প্রিন্ট করা হয়, আর না হলে বুনে যে ডিজ়াইনগুলো হয়, সেগুলো একদম সিম্পল। বেনারসি কিংবা কাঞ্জিভরমে যে রকম ইলাবরেট ডিজ়াইন হয়, বিষ্ণুপুরে এখন সে রকম ডিজ়াইন হচ্ছে না,'' বললেন তিনি।

কীভাবে তৈরি হয় বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি? বুঝিয়ে বললেন দেবাশিস, ''টানা সুতো আসে বেঙ্গালুরু থেকে। আর পড়েনের সুতো আসে মালদহে যে রেশম চাষ হয়, সেখান থেকে। এখন অবশ্য পড়েনের সুতোও বেঙ্গালুরু থেকে আসছে। টানার সুতো প্রথমে ১০০ ডিগ্রি জলে সোডা দিয়ে সেদ্ধ করে, ক্ষার বের করে নিতে হয়। আড়াইশো গ্রাম মতো ওজন কমে যায় তাতে। তারপর গরম জলে রং দিয়ে, রং করতে হয়। ক্ষারাই করার পর পুকুরে কেচে, রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর সুতোগুলোকে ছোট করে নিতে হয়। সুতোয় ডায়ামিটার তো বড় থাকে, সেগুলো অন্য ছোট রিলে দিয়ে ছোট করতে হয়।'' একটা তাঁতে মোটামুটি হাজারচারেক

সুতো লাগে, জানালেন তিনি। সুতোকে তাঁরা বলেন 'খি'। পড়েনের সুতোও একইভাবে রিলে গুটিয়ে, তারপর পাকাতে হয়। তার পরে মাকুতে লাগিয়ে, বুনন হয়। কী রকম সময় লাগে একটা শাড়ি বুনতে? ''যাঁদের বয়স কম, স্পিডে বুনতে পারেন, তাঁদের দেড়দিন-দু'দিন লাগে। প্লেন কাপড় করলে এক-দেড়দিনে হয়ে যেতে পারে। আবার কেউ যদি ডিজ়াইন করেন শাড়িতে, তা হলে দু'দিন কি তিনদিন লেগে যায়।'' শাড়িতে কতটা কাজ থাকছে, যিনি বুনছেন তিনি কতটা স্পিডে বুনছেন, তার উপরেই সময়টা নির্ভর করে।
দক্ষিণাপণের এক শাড়ি বিপণির ম্যানেজার অশোক কুমার সাহা বললেন, ''বিষ্ণুপুরি সিল্ক আদতে হল মালবেরি সিল্ক। সিল্ক প্রধানত চার ধরনের হয়— মালবেরি, তসর, মুগা, এরি। মুগা এবং এরি সিল্ক কম হয়। এই চার ধরনের সিল্কের মধ্যে মালবেরিই একমাত্র কালচার করা যায়, ঘরে পোকা রেখে, তাকে খাবার দিয়ে। বাকি ভ্যারাইটিগুলো সবই ওয়াইল্ড — তসরের গুটিও গাছেই হয়। এই মালবেরি সিল্ক বিভিন্ন জায়গায় বুনে কখনও তৈরি হয় মুর্শিদাবাদ সিল্ক, কখনও বিষ্ণুপুরি সিল্ক, কখনও বেঙ্গালুরু সিল্ক। কিন্তু ইয়ার্নটা সর্বত্রই এক। কোকুন বা গুটি বিষ্ণুপুরে সেভাবে তৈরি হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় মালদহ বা মুর্শিদাবাদে। বিষ্ণুপুরে উইভিং হয়। একটা হয় প্লেন সিল্ক — মালবেরি থেকে ডিগাম্বিং করে, ডাই করে প্রিন্ট করা হয়। আঠার মতো একটা লেয়ার থাকে, যেটাকে কোরা বলে। সেটাকে ছাড়ানোর যে পদ্ধতি, তারই নাম ডিগাম্বিং। এই লেয়ারটা যদি না ছাড়ানো হয়, তা হলে পোকায় কেটে দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। রংও ধরে না। প্লেন সিল্ক ছাড়া আর এক ধরনের শাড়ি হয়, চলতি কথায় কাতান বলে তাকে। সেখানে সুতোকে রং করে, তারপর উইভ করা হয়। অনেক সময় তাতে একটা বাইকালার শেড আসে। টানা আর বানা-য় দু'রকম রঙের সুতো দেওয়ার ফলে একটা গ্লসি রং হয় শাড়ির। সুতোর যে রিলিং হয়, তারও এক্সপার্ট লোকেরা অনেকেই মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের হন।''
বিষ্ণুপুরি সিল্কের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বললেন অশোক, ''একটা বৈশিষ্ট্য হল, এই সিল্ক একটু থিক কোয়ালিটির হয়। মুর্শিদাবাদ সিল্ক যে সুতোয় বোনা হয়, বিষ্ণুপুরি সিল্কেও একই সুতো লাগে। কিন্তু বিষ্ণুপুর, সোনামুখি বা আশপাশের এলাকার সিল্ক বোনাটা একটু জমাট হয়। আর সুতো রং করে বোনাটা বিষ্ণুপুরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণুপুরি সিল্কের বর্ডারে জ়রিও ব্যবহার হয় অনেক সময়। মুর্শিদাবাদ সিল্কে জ়রি দেওয়া একটু সমস্যার। কারণ ডিগাম্বিং করতে হয় আবার— গরম জলে সেদ্ধ করে, তাতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে ডিগাম্বিংয়ের যে পদ্ধতি, তাতে জ়রি নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময়। বিষ্ণুপুর সিল্কে সুতোকে ডিগাম্ব করে, রং করা হয়। তারপর আর জ়রি বসাতে কোনও সমস্যা থাকে না।'' মোটিফ বা প্রিন্ট বিষ্ণুপুর সিল্কে মুর্শিদাবাদ সিল্কের চেয়ে খুব আলাদা কিছু হয় না বলেই মনে করেন অশোক। বললেন, ''আমাদের এখানে প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রি সবচেয়ে বড় হল হুগলি-শ্রীরামপুরে। তাঁরা মুর্শিদাবাদ সিল্ক বলুন বা বিষ্ণুপুর সিল্ক, একই ধরনের প্রিন্ট করেন। এক সময় বিষ্ণুপুরে দু'একটা কারখানা ছিল। তাঁরা বালুচরি ধরনেরই প্রিন্ট করতেন— পালকিবাহকের মোটিফ বা কলকা বুটি জাতীয় জিনিস ব্যবহার করতেন প্রিন্টে। কিন্তু এই মুহূর্তে বোধ হয় সেই ট্রেন্ড খুব একটা নেই। বিষ্ণুপুরি সিল্ক আমি যতটা দেখেছি, তাতে এটা বলতে পারি নিম্নমানের সিল্ক খুব একটা হয় না ওখানে। গুণমান সার্বিকভাবে ভাল হয়।''


বিষ্ণুপুরি সিল্ক

বিষ্ণুপুরি সিল্ক দেখতেও যেমন মার্জিত, তার অ্যাকসেসরাইজ়েশনও তেমন হলেই ভাল হয়। খুব লাউড সাজ বিষ্ণুপুরি সিল্কের জন্য নয়। সুন্দর ব্লাউজ়, হালকা গয়না (মুক্তোর গয়না খুব ভাল লাগবে এই শাড়ির সঙ্গে) আর ছিমছাম সাজ, ব্যস আর কিচ্ছু লাগবে না। শাড়িই ফুটিয়ে তুলবে আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি।

প্রথম পাতার শাড়ি: সাদার উপর হলুদ ও ম্যাজেন্টা ফ্লোরাল প্রিন্টেড বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি। হালকা গয়নার সঙ্গে এলিগ্যান্ট সাজ।
শাড়ি (প্রথম পাতা): কুনবি, **ফোন:** ৯১৬৩৪৫৫৫০০

শেষের পাতার শাড়ি: অলিভ গ্রিন কালার বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়িতে হ্যান্ড বাটিক প্রিন্টেড ট্র্যাডিশনাল বিষ্ণুপুর সিল্ক শাড়ি।
শাড়ি: বিন্দি, ৪২ এ, ডঃ শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রেড, কলকাতা- ৭০০০২৯, **ফোন:** ৮৩৭৬৮২৭২২২
গয়না: করিশ্মাজ়, **ফোন:** ৮৬৯৭১১৩৩৬৭

মডেল: কোয়েল
মেক-আপ: বাবুসোনা সাহা, **ফোন:** ৮২৪০৫৫০৮৮৪,
স্টাইলিং: অয়ন হোড়, **ফোন:** ৯০০৭২২০৪৯৬
ছবি: সোমনাথ রায়


চলছে সিল্ক তৈরির কাজ



এই বাংলার শাড়ি

বাংলায় বোনা গামছা-পোশাক

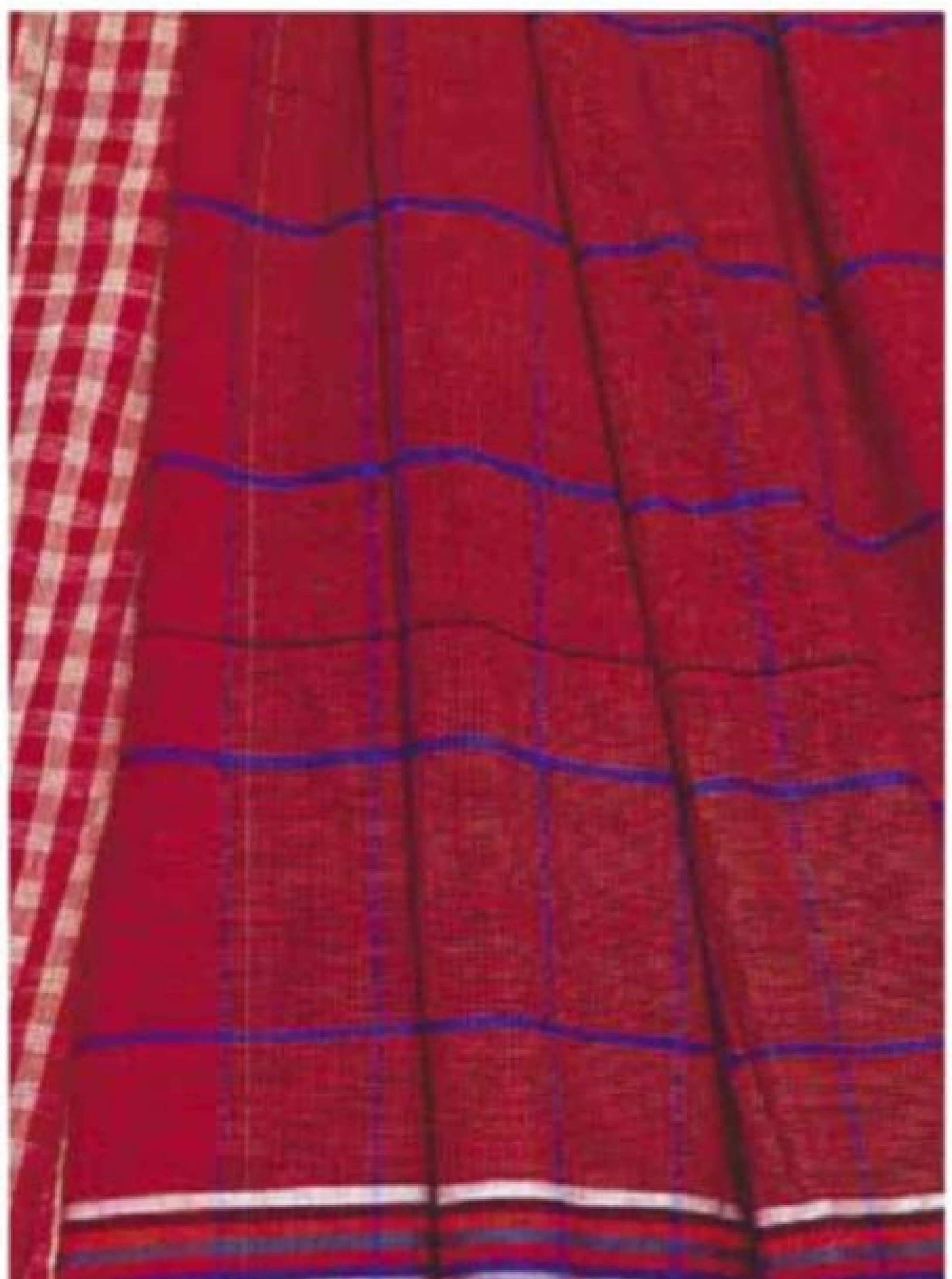
গামছার জমিতে নকশা ফুটিয়ে শাড়ি বা ড্রেস, পুরুষদের পোশাক...গত পাঁচ-ছ'বছরে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে এধরনের পোশাক। বাংলাদেশে আগে থেকেই জনপ্রিয় ছিল গামছা-পোশাক। এবাংলায় জনপ্রিয়তা পেতে একটু সময় লাগলেও, বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটি। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।

'গামছা'র মেটেরিয়াল, তাতেই নানা নকশা...দেখতে ট্রেন্ডি ও সমকালীন। শাড়ি, ড্রেস থেকে পুরুষদের পোশাক... গত পাঁচ-ছ'বছরে ফ্যাশনে বেশ জনপ্রিয় গামছার ফ্যাব্রিক। বাংলাদেশে আগেই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, প্রায় গোটাটাই সেদেশের প্রখ্যাত ডিজ়াইনার বিবি রাসেলের হাত ধরে। এপার বাংলাতেও দিনে দিনে জনপ্রিয় ও বিবর্তিত হচ্ছে গামছা। আরামদায়ক ফ্যাব্রিক। গামছার শাড়ি বলতেই একটা সময়ে যাঁরা ভ্রূ কুঁচকোতেন, তাঁরাও এখন দিব্যি মজেছেন এতে। আর সাসটেনেবিলিটির কথা মাথায় রেখেও অনেক ডিজ়াইনারই আজকাল গামছার ফ্যাব্রিক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

দীর্ঘদিন ধরে গামছায় নানা ডিজ়াইন নিয়ে কাজ করছেন লেবেল থ্রেডবাবা-র ঋক। তাঁর কথায়, ''নদীয়ার ফুলিয়া, শান্তিপুরই ছিল গামছা বুননের আগের বেল্ট। মুর্শিদাবাদের তর্তিপুর বলে একটি জায়গায় প্রচুর গামছা বোনা হয়। ইক্কত বা কোটকি গামছার উৎপাদন এখানে

সাদা কালো গামছা চেকস। কুঁচিতে লালের ইউনিক ডিজ়াইন। যোগ্য সঙ্গতে হুডেড গামছা ব্লাউজ় ও গয়না।

বেশি। এখন তো পাওয়ারলুমেও গামছা বোনা হয়। তাই, পুরনো তাঁতিদের অনেকেই এখন কর্মহীন। তর্তিপুরেই যেমন ধরুন না। এখন বোধহয় দু'-তিন ঘর তাঁতিরাই গামছা বোনেন। উৎপাদন কমে যাচ্ছে বলে ওদের গামছা, রংয়ের দিক থেকে ভাইব্র্যান্ট হলেও, ব্যবহার করতে পারছি কম। এছাড়া উত্তর দিনাজপুরে, বোলপুর-বীরভূমে অঞ্চলে ট্রাইবাল গামছা বোনা হয়। সাঁওতাল পরগণায় গামছা বলা হয় না, 'পান্থি' বলে। উত্তর দিনাজপুরে সলিড কালারের (হলুদ, লাল ইত্যাদি) ব্যবহার, আঁচলে থ্রেডওয়র্ক ইত্যাদি এর বৈশিষ্ট্য। অসমের গামছার একটা প্রভাব রয়েছে এখানে। বসিরহাটের কাছে একটা সময়ে 'তাঁতিপাড়া' নামের গ্রামই ছিল গোটা! কিন্তু সেখানেও তাঁতিদের নতুন প্রজন্ম কেউই বিশেষ গামছা বুনতে উৎসাহী নয়। আমি আগে তর্তিপুর, উত্তর দিনাজপুর থেকে র মেটেরিয়াল



আনতাম। কিন্তু কোভিডের ফলে, ওরা এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে বুনন বিভাগটাই প্রায় উঠে যাচ্ছে। একদিনে চারটে থান গামছা বুনে একজন তাঁতির রোজগার থান প্রতি ১৫০-২০০ টাকা পায়। তিনদিনে শাড়ি বুনলে কম করে হলেও ৭০০ টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু শাড়ির ক্ষেত্রে কাজ অনেক কম। তাই, আমার



উজ্জ্বল লাল-সাদা রঙের সনাতন কম্বিনেশন। গামছা শাড়ির কুঁচিতে অফ হোয়াইট কালার ব্রেক। বিডেড গয়নায় স্মার্ট লুক।



> অঞ্চলভেদে গামছার বুননশৈলীতেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের গামছায় যেমন অসমের কিছু প্রভাব লক্ষ করা যায়। বোল্ড সলিড কালারস এখানকার গামছার বৈশিষ্ট্য। আবার মুর্শিদাবাদের তর্তিপুরে ইক্কত বা কোটকি গামছার প্রচলন।

কাছে নদীয়া, ফুলিয়া, শান্তিপুরই অপশন। বাংলাদেশে বিবিদি (বিবি রাসেল) অনেকদিন ধরেই গামছা নিয়ে কাজ করছেন। লন্ডন থেকে ফিরে উনি উইভারদের থেকে গামছা সংগ্রহ করতেন। তবে তারপরে তাঁর ডিজ়াইন স্টাইল বদলালো, গামছাতেই আর সীমাবদ্ধ রইল না। গামছা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উনি নতুন টেক্সটাইল সৃষ্টি করছেন। গামছার বহর সাধারণত পৌনে এক-এক হাত। লম্বায় সাড়ে চার-পাঁচ হাত। আমরা এই গামছাই প্রোকিউর করি। হ্যাঁ, হয়তো যিনি বুনছেন, তাঁকে বলে দিই কী ধরনের সুতো ব্যবহার করবেন। বা রং আর একটু ভাল দিন। এরকম গামছা তাঁতিদের থেকে বুনিয়ে আনি, তারপর আমি ডিজ়াইন করতে বসি। কোন গামছার সঙ্গে কী কালার কম্বিনেশন যাবে। কোনও ক্ষেত্রে হয়তো পরপর তিনটে গামছা জোড়া হল, কিন্তু শাড়ির বহরে তা যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে পাড়ে বা আঁচলে কী যাবে, কোথাও হয়তো গামছার জমির সঙ্গে পাড়ে কাঁথার বুনন ব্যবহার করা হল। গামছা শাড়ি এভাবেই তৈরি হয়। গামছার সঙ্গে গামছা জোড়া হয় সেলাইয়ের মাধ্যমে। তারপরে পাড়, আঁচলের ডিজ়াইন। ২০১৫ সালে আমি যখন গামছা নিয়ে কাজ করতে শুরু করি, তখন বাংলায় সেভাবে কেউ কাজ করতেন না এ নিয়ে। অনেকে বক্রোক্তিও করতেন, 'একি গামছাও পরা যায় নাকি!' 'গামছা'র আবার এত দাম হয় নাকি, এমনটাও অনেকে জিজ্ঞেস করতেন। গামছায় ড্রেস বা শাড়ির জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করল তারপর থেকে। মিডিয়াতেও অনেক লেখালেখি হত। তবে এখন আবার গামছা শাড়ি অনেকটাই সহজলভ্য হয়ে গিয়েছে। খোলা বাজারেই সহজেই, কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। তবে তাঁতিরা নিজে হাতে বুনে, ডিজ়াইনারদের নকশা তোলা শাড়ি কিন্তু আলাদা। কিছুদিন আগে আমার তৈরি গামছার জমির আঁচলে হাতে বোনা কাঁথায় উত্তম-সুচিত্রার মুখ উঠে এসেছে। গামছা শাড়ির ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় বলি, শাড়ির স্টিচিং বেশিরভাগই গ্রামের মহিলারা করেন। নিউটাউনের কাছে আকন্দকিশোরি গ্রাম আছে। এখানে সেলাই জানা কিছু মানুষ আছেন। ২০১৫ থেকেই এখানকার মানুষেরা, বিশেষত



মহিলারা আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। এই মহিলারা সারাদিন ঘর-সংসার সামলে শাড়ি বোনেন। একভাবে এঁরাও এমপাওয়ারড হয়েছেন।''

পোশাক-শিল্পী শ্যাম বিশ্বাস অনেকদিন ধরেই রিভাইভাল আর্ট নিয়ে কাজ করছেন। তিনি জানালেন, ''গামছা শাড়ির উৎপাদন হয় বাংলার নানা অঞ্চলে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে মূলত গামছা বোনেন শিল্পীরা। শান্তিপুর-ফুলিয়াতে আগে অনেক বেশি উৎপাদন হত, এখন কম হয়। শান্তিনিকেতনেও একটি বিশেষ ধরনের গামছা বোনা হয়। বেশিরভাগ গামছা পাওয়ারলুমে বোনা হয়, হ্যান্ডলুমে খানিকটা কমই বোনা হয়। শান্তিনিকেতনের গামছা বোনার ক্ষেত্রে মোটা সুতো ব্যবহার করা হয়। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে আবার ফাইন কাউন্টের সুতো। ডিজ়াইনের ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। সিঙ্গল প্লেন শেডের গামছা মূলত শান্তিনিকেতনের। আর বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর বা শান্তিপুর-ফুলিয়াতেও ট্র্যাডিশনাল চেকস গামছার ফ্যাব্রিকেই কাজ করেন তাঁতিরা। গামছা আসলে একধরনের ইন্সপিরেশন। ডিজ়াইনারের কাজই হল একটি বিষয়কে ভিত্তি করে, তার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু তৈরি করা। গামছা এখানে সেই বিষয়, সাবজেক্ট। বাংলাদেশে যেমন বিবি রাসেলের হাত ধরে গামছা জনপ্রিয়তা পেয়েছে বহুগুণ। তবে তিনি গামছা কেটেই যে পোশাক তৈরি করেন তেমনটা নয়। গামছা শুধুমাত্র একটি



ইন্সপিরেশন এক্ষেত্রে। যেমন বিবি রাসেলের শাড়িগুলোয় গামছা হয়তো দেড়-দু'মিটারের। ঠিক যেমন বেনারসি বা বালুচরি ফ্যাব্রিক দিয়ে ছেলে-মেয়ে উভয়েরই নানা পোশাক তৈরি হয়। আমি যেমন গামছার সনাতন চেকস প্যাটার্নের বদলে তাকে মূল ভিত্তি করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। আউটফিটে গামছার টেক্সচার ব্যবহার করেছি, বোল্ড চেকসের বদলে ছোট চেকস ব্যবহার করেছি, জামদানি যোগ করেছি। সাধারণত গামছার বোল্ড কালার হয়, লাল, সবুজ, কালো। এর বদলে একটু প্যাস্টেল শেডে নিয়ে এসেছিলাম।''

মোটের উপর, গামছা নিয়ে এখন অনেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। নানাভাবে বিবর্তিত হচ্ছে আপাত নিরীহ এই কাপড়। নতুন নকশা, নতুন ভাবনার আঙ্গিকে নতুনভাবে চিনছি আমরা গামছাকে, প্রতিনিয়ত।

প্রথম ও দ্বিতীয় পাতার ছবি:
মডেল: অনন্যা
মেক-আপ ও হেয়ার: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
পোশাক ও প্রথম পাতার গয়না: গ্রেড বাবা বাই ঋক, **ফোন:** ৯৬৮১৬৭৪৭৮৭
দ্বিতীয় ছবির গয়না: আঁকিবুকি অদিতি
ফোন: ৯৭৪৮৪৬১১০৫
স্টাইলিং: তন্ময় বিশ্বাস, **ফোন:** ৯৮৭৪৬৫০৮৬৯
ছবি: সোমনাথ রায়
বাকি ছবি: ঋক ও ইন্টারনেট



মাল্টিকালারড হ্যান্ড পেন্টেড বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি। আঁচলে বাটিকের কাজ।

শাড়ি: বিন্দি
গয়না: করিশ্মাজ়

বাংলার শাড়ি-সংস্কৃতি

‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’...কবি বাংলার আয়নায় জীবনের নানা প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। ঠিক সেভাবেই বাংলার পোশাক-সংস্কৃতির আয়নায় উঠে আসে বৈচিত্র, ঐতিহ্য আর অভিনবত্বের মেলবন্ধন। হোমগ্রোন ব্র্যান্ডের বাংলার শাড়ির সম্ভার নিয়ে বিশেষ ফিচার।



কালোর উপর লাল ফ্লোরাল মোটিফ করা খাদি কটন শাড়ি। আঁচলে হালকা জ়রির কাজ নজর কাড়ে।

শাড়ি: বিন্দি স্টুডিয়ো
গয়না: করিশ্মাজ়



হ্যান্ড পেন্টিংয়ে বাংলার তাঁতের শাড়ি। আঁচলে ও পাড়ের কাছে মাল্টিকালারড মাছের মোটিফ। ফ্রিল ওয়র্ক করা স্ট্র্যাপি টপের সঙ্গে স্টাইলিশ লুকে বাংলার ব্লক প্রিন্টেড শাড়ি।

শাড়ি: পূরবী
গয়না: করিশ্মাজ়



গোলাপি রেশম পাড়ের ধূসর রঙের ধনেখালি শাড়ি। সঙ্গে হ্যান্ডক্রাফ্টেড গয়না।

শাড়ি: সন্ধ্যারাগ,
ডা. দীপান্বিতা হাজ়ারি
গয়না: আঁকিবুকি অদিতি,
ব্যাঙ্গল: স্বস্তিক ক্রিয়েশন



বাংলার ট্র্যাডিশনাল ধনেখালি শাড়ি। বেজ রঙের শাড়িতে হরাইজ়ন্টাল মাল্টিকালারড সুতোর কাজ। সঙ্গে ডোকরার নেকপিস।

শাড়ি: বিন্দি স্টুডিয়ো
গয়না: কুনবি





(বাঁদিকের ছবি) ট্র্যাডিশনাল তসর শাড়ির জমিতে কাঁথাস্টিচের মাছের মোটিফ। আঁচলে ভরাট কাজ।

শাড়ি: সন্ধ্যারাগ, ডা. দীপান্বিতা হাজ়ারি
ব্লাউজ়: পূরবী
গয়না: করিশ্মাজ়

চিরন্তন লাল-সাদার যৌথতায় বেগমপুরি শাড়ি। রুপোর গয়নায় সম্পূর্ণ লুক।

শাড়ি: মনপাখি বুটিক
গয়না: করিশ্মাজ়



সাদা ও গোলাপি ব্লক প্রিন্টেড তাঁতের শাড়ি। আঁচলে কালোর কম্বিনেশনে ব্লক প্রিন্ট।

শাড়ি: সন্ধ্যারাগ, ডা. দীপান্বিতা হাজ়ারি
গয়না: করিশ্মাজ়





(বাঁদিকের ছবি)
সাদা মলমলের উপরে
লাল কাগজের ছাপা
অক্ষরের ইউনিক প্রিন্ট।
টিম-আপ করা হয়েছে
ব্লেজ়ারের সঙ্গে।

শাড়ি: মনপাখি বুটিক

রাস্ট রেড কালারড
বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ির
পাড় ও আঁচলে
কাঁথাস্টিচের কাজ।

শাড়ি: সন্ধ্যারাগ, ডা.
দীপান্বিতা হাজ়ারি
গয়না: স্বস্তিক ক্রিয়েশন





বিষ্ণুপুরি সিল্কে
মাল্টিকালারড হ্যান্ড
বাটিক প্রিন্টেড শাড়ি।

শাড়ি: কুনবি, গয়না:
আঁকিবুকি অদিতি



(বাঁদিকের ছবি)
সাদা তাঁতে গোলাপি ব্লক প্রিন্টেড শাড়ি।
শাড়ি: সন্ধ্যারাগ,
ডা. দীপান্বিতা হাজ়ারি ,

গয়না: আঁকিবুকি অদিতি

হ্যান্ড বাটিক প্রিন্টেড বিষ্ণুপুরি সিল্ক। অন্যজনের পরনে ব্লক প্রিন্টেড সুতির শাড়ি।

শাড়ি (বাটিক প্রিন্ট): কুনবি
ব্লকপ্রিন্ট শাড়ি: বিবিধ
ফোন: ৯৮৩১১৮৬১৪৯
গয়না: আঁকিবুকি অদিতি



বাংলার ঐতিহ্যবাহী
ব্লক প্রিন্টেড লাল হলুদ
কম্বিনেশনে সুতির শাড়ি।

শাড়ি: বিবিধ
গয়না: আঁকিবুকি অদিতি



গাঢ় সবুজ
বালুচরির জমি
জুড়ে সোনালি
রঙের নকশা।
আঁচলে ঠাসবুনোট
কাজে দৈনন্দিন
যাপনের গল্প।

শাড়ি: বিন্দি স্টুডিয়ো
ফোন: ৮৩৭৬৮২৭২২২



বেজ-ইন্ডিগোর কম্বিনেশনে গাছি তসর। জমি, আঁচল ও পাড়ে হ্যান্ড প্রিন্টেড নকশা।

ডান ও বাঁ পাতার শাড়ি: সুপ্রিয়
ফোন: ৯৮৩০০৩৭৯১২
গয়না: স্বস্তিক ক্রিয়েশন



বাংলার নিজস্ব গাছি তসরের উপরে হ্যান্ড প্রিন্ট। আঁচলে কাঁথার নকশা। টিম-আপ করা হয়েছে ডেনিমের জ্যাকেটের সঙ্গে।



সাদা জমির
ট্র্যাডিশনাল গরদ।
লাল-সোনালি
চওড়া পাড়ের
শাড়িতে সোনালি
বুটি। অন্যজনের
পরনে লাল-সবুজ
গঙ্গা যমুনা পাড়।

ডান ও বাঁদিকের পাঁতার
শাড়ি: সন্ধ্যারাগ বুটিক, ডা.
দ্বীপান্বিতা হাজারি
ফোন: ৯৮৩০০৩২৫৩৭



মাল্টিকালার্ড সিল্ক
গরদ। নজর কাড়ে
ইউনিক ড্রেপিং ও
করসেট ব্লাউজ়।

বিডসের গয়না: স্বস্তিক
ক্রিয়েশন
ফোন: ৭০৪৪৯৭৫২৩২



বাংলায় বোনা
গামছা শাড়ি।
শাড়িজুড়ে নানা
রঙের খেলা।
মাল্টিকালার্ড
শাড়ির আঁচলে
আসমানি নীলের
স্নিগ্ধতা।

ডান ও বাঁজিকের পাতার
শাড়ি: লেবেল থ্রেড বাবা
বাই ঋক
ফোন: ৯৬৮১৬৭৪৭৮৭
গয়না: করিশ্মাজ়
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭



নানারঙের গামছার সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে শিল্পশৈলী। আঁচলে ট্র্যাডিশনাল লাল চেকস।

গয়না: আঁকিবুকি অদিতি
ফোন: ৯৭৪৮৪৬১১০৫
ব্যাঙ্গল: কুনবি
ফোন: ৯১৬৩৪৫৫০০



বাংলার নিজস্ব কাঁথাশিল্পের একটুকরো নিদর্শন। তসরের পাড়-আঁচলে কাঁথার কাজ। অন্যটিতে সাদা কালা কটনের আঁচলজুড়ে কাঁথার নকশার আঁকিবুকি।

শাড়ি: ইন্ডিগো এথ
ফোন: ৯৮৩০৮৮৪১৭৩
গয়না: স্বস্তিক ক্রিয়েশন



হাতে বোনা খাদি কটন। লাল-সাদা-কালোর কম্বিনেশন আলাদা করে নজর কাড়ে।

শাড়ি: পূরবী বুটিক
ফোন: ৯৯৩২৩৭৬৯৬৬



রেশম পাড়ের তাঁতের শাড়ি। শাড়ির জমিতে কাঁথার ফ্লোরাল মোটিফ।

শাড়ি ও ব্লাউজ়: পূরবী বুটিক
গয়না: করিশ্মাজ়



পেস্তারঙের খাদি
হ্যান্ডলুম শাড়ির
পাড় ও আঁচলে
উজ্জ্বল কমলার
রেফারেন্স।

শাড়ি: মনপাখি বুটিক
ফোন: ৬২৯০০২৮৯৫৫
গয়না: করিশ্মাজ়





বিষ্ণুপুরি সিল্কের উপর হ্যান্ড বাটিকের ফ্লোরাল মোটিফ। আঁচলে কাঁথাস্টিচ শাড়ির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে বহুগুণ।

শাড়ি: সেলফ স্টোরি বাই শান্তনু গুহঠাকুরতা ও সুমিত ঘোষ চৌধুরী
ফোন: ৯৭৪৮৭৫৬৩৬৪
নেকপিস: স্বস্তিক ক্রিয়েশন



পাউডার পিঙ্ক মটকা মসলিন শাড়ির আঁচলে একই কালার প্যালেটের মোটিফ। হালকা রঙেও গ্ল্যামারাস।


শাড়ি: বিন্দি স্টুডিয়ো



বিষ্ণুপুর সিল্কের উপর হ্যান্ড বাটিকের ছাপ। আর কাঁথার ইটারনাল যৌথতা।

শাড়ি: সেলফ স্টোরিজ় বাই শান্তনু গুহঠাকুরতা ও সুমিত ঘোষ চৌধুরী
নেকপিস: স্বস্তিক ক্রিয়েশন





সবুজ সিল্কের উপরে কাঁথার কাজ। মাল্টিকালার্ড আঁচলে অনন্য আবেদন।

শাড়ি: মনপাখি বুটিক
ব্যাঙ্গল: স্বস্তিক ক্রিয়েশন



গমরঙা গাছি তসরের উপর লাল নকশি কাঁথার কাজ। আঁচল, পাড় ও জমিতে লাল পদ্মর মোটিফ।

শাড়ি: সেলফ স্টোরি বাই শান্তনু গুহঠাকুরতা ও সুমিত ঘোষ চৌধুরী
ব্যাঙ্গল: আঁকিবুকি অদিতি



উজ্জ্বল সবুজ স্বর্ণচরির জমিতে সোনালি-লালের কম্বিনেশন। স্বর্ণচরির বৈশিষ্ট্যই হল সোনালি জ়রির মীনাকারি কাজ।

শাড়ি: সন্ধ্যারাগ বুটিক

মডেল: রিয়া, শ্রীময়ী, কোয়েল, দময়ন্তী, অনন্যা, ডিম্পল, স্নেহা, মুনমুন, রিয়া বণিক
মেক-আপ (অনন্যা, ডিম্পল, স্নেহা, মুনমুন, রিয়া বণিক): নবীন দাস,
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮,
স্টাইলিং: তন্ময় বিশ্বাস,
ফোন: ৯৮৭৪৬৫০৮৬৯,
মেক-আপ (রিয়া, শ্রীময়ী, কোয়েল, দময়ন্তী): বাবুসোনা সাহা, ফোন: ৮২৪০৫৫০৮৮৪
হেয়ার: অঙ্কিতা দত্ত,
স্টাইলিং: অয়ন হোড়,
ফোন: ৯০০৭২২০৪৯৬,
স্টাইলিং (রিয়া বণিক): নীল সাহা, ফোন: ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩
ছবি: সোমনাথ রায়



ফ্যাশনের মঞ্চে হারানো ভারত

সম্প্রতি কলকাতায় একটি পাঁচতারা হোটেলে হয়ে গেল ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা আয়োজিত এক জাকজমকপূর্ণ ফ্যাশন শো ‘Elixir 2022।’ এই ফ্যাশন শো-তে হারিয়ে যাওয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়েছিল। ফ্যাশনে উল্লেখযোগ্য ‘রঙ্গমঞ্চ’, যা পশ্চিমবঙ্গের হারিয়ে যাওয়া যাত্রা পালা থেকে অনুপ্রাণিত, ‘শিলকাটো’ যা হারিয়ে যাওয়া শিলের ডিজ়াইন ও রং-কে এনেছে ফ্যাশনের মঞ্চে। এছাড়া বিহারের লোকসঙ্গীতের আদলে ‘লোর অফ নয়নাযোগিনী’, ক্যালেন্ডারের অনুপ্রেরণায় ‘দিনলিপি’ প্রভৃতিও দেখা গেল। র‍্যাম্পে দেখা গেল বিশিষ্ট অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায়-কে।

শহরে নতুন স্বাদের সম্ভার

শহরের একটি প্রসিদ্ধ কাফের পক্ষ থেকে হয়ে গেল ভিন্ন স্বাদের খাবারের ইভেন্ট। সেখানে ছিল ইউরোপীয় রান্না থেকে পিৎজ়ার নানা ধরন। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা



রাহুল দেব বোস ও অঙ্গনা রায়। কাফে-মালিক সুজাতা সিংহের কথায়, “বিশেষভাবে ইউরোপীয় ও আইরিশ ঘরানার কিছু ডিশের আয়োজন করা হয়েছে, রয়েছে ভেজ-ননভেজ দু’ধরনের ফুড আইটেম। স্বাদের কথা মাথায় রেখে কফি, মকটেল সবকিছুর আয়োজন আছে।”



সিনেমার প্রচারে শহরে তারারা

সম্প্রতি ‘দোবারা’ ফিল্মের প্রচারে শহরে এলেন তাপসী পন্নু, একতা কাপুর ও পাভেল গুলাটি। একটি টক শো-তে নারী ক্ষমতায়নের উপর আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মুহূর্তে বলিউডে নারীকেন্দ্রিক সিনেমার অন্যতম মুখ তাপসী জানান, ফ্যান্সি নায়িকাদের মাঝে তাঁকে তার আলাদা পথ তৈরি করতেই হত। তাই এই ধরনের ছবিই বাছেন তিনি। ‘পিঙ্ক’, ‘সান্ড কি আঁখ’ কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে ‘সাবাশ মিঠু’তে তাঁর অভিনয় সকলের মন ছুঁয়েছে। এই সিনেমাতেও রয়েছে ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের আলো। সেখানেও যথারীতি যথাযথ তাপসী। বক্তব্য রাখেন প্রযোজক একতাও। আলোচনার শেষে দেখানো হয় ছবির ট্রেলার। সব মিলিয়ে তারকাদের উপস্থিতি ও বক্তব্যে জমজমাট ছিল সেদিনের অনুষ্ঠান।

স্বাধীনতার ৭৫-এ

স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনে সংগীতজুটি সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ-এর উদ্যোগে ভারতের ৭৫ জন তাবড় সংগীত ও যন্ত্রশিল্পীদের নিয়ে নির্মিত হল অখণ্ড জাতীয় সঙ্গীত– ‘জয় হে ২.০’। শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে হল মিউজ়িক্যাল লঞ্চ। আশা ভোঁসলে থেকে শুরু করে হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, শিবমণি, শঙ্কর মহাদেবন, শ্রেয়া ঘোষাল, রশিদ খান, শুভা মুদগল-এর পাশাপাশি পার্বতী দাস বাউল, তেজান বাঈ, সুজাতা মোহনের মতো শিল্পীদের দেখা গেল সেই গানে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ সহ ঊষা উত্থুপ, রূপম ইসলাম, অনুপম রায়, সোমলতা আচার্য প্রমুখ। জুমের মাধ্যমে যোগ দিয়েছিলেন শ্রীনিবাস, পাপন, বম্বে জয়শ্রী প্রমুখ। সকলেই ভাগ করে নিলেন এই উদ্যোগে সামিল হওয়ার অভিজ্ঞতা। সৌরেন্দ্র’র কথায়, “করোনা পরবর্তীতে ভাবা হয়েছিল তেমন



সাড়া হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু বাস্তবে হয়েছে তার উলটো।” সব মিলিয়ে জমজমাট সেদিনের অনুষ্ঠানে ধ্বনিত হল স্বাধীনতার জয়গান।





শাড়ির ব্যবসায় স্বনির্ভর

রোজগারের মাধ্যম করে তুলুন শাড়িকে। প্ল্যানিং এবং অন্যান্য জরুরি পদক্ষেপ যদি বুঝে করতে পারেন, তবে এ ব্যবসার মার নেই! শাড়ির ব্যবসা করতে গেলে কী কী মাথায় রাখতেই হবে? শাড়ি-অন্ত্রপ্রনরদের থেকে জেনে নিলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী, সায়নী দাশশর্মা এবং মধুরিমা সিংহ রায়।

শাড়ি ভালবাসেন না, এমন মহিলা বিরল। তাই শাড়িকে বলা চলে এমন এক পণ্য, যার বাজার একবার ধরে ফেলতে পারলে লাভ নিশ্চিত। আর এমনও নয়, যে প্রচুর টাকা বা খুব ভাল পরিকাঠামো না থাকলে এই ব্যবসা করা যাবে না। আপনার-আমার মতো ঘরের মেয়েরাও কিন্তু শাড়িকে মাধ্যম করে হয়ে উঠতে পারেন অন্ত্রপ্রনর। হ্যাঁ, তার জন্য সময় এবং পরিশ্রম লাগবে, মাথায় রাখবে হবে নানা বিষয়ও। কিন্তু প্ল্যানিং যদি ঠিক থাকে, যদি নিজের ব্যবসাকে ভালবেসে পরিশ্রম করতে পারেন তার জন্য, তা হলে ব্যবসা আপনার হবেই। কী কী বিষয় মাথায়



নয়াগ্রামের পটচিত্র

> শাড়ি সোর্স করার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করতে হবে। শান্তিপুর, ফুলিয়া ইত্যাদি জায়গার গিয়ে তাঁতিদের সঙ্গে কথা বলা যায় সরাসরি। বড়বাজারের মতো জায়গা থেকেও শাড়ি তুলতে পারেন।

রাখতে হবে? তার জন্য তো আমরা রয়েছি! শাড়ির ব্যবসা করে যাঁরা স্বনির্ভর হয়েছেন, এমন কিছু মহিলার সঙ্গে কথা বলে সাজিয়ে দিলাম গাইডলাইন...

ছকে নিন স্ট্র্যাটেজি

শাড়ির ব্যবসা শুরু করতে গেলে বিশাল কিছু টাকা ঢালতে হবেই, এমন কোনও ব্যাপার কিন্তু নেই! 'জীবন তরু' বুটিকের কর্ণধার সায়নী সাহা যেমন জানালেন, তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন ১৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে। বেঙ্গালুরুতে থাকেন তিনি। বাড়ি থেকেই ব্যবসা চালান। অল্প করে স্টক তোলেন, ফলে অনেক জায়গাও লাগে না শাড়ি রাখার জন্য। বললেন, "প্রথম থেকেই কম স্টক তুলে, নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলগুলোয় পোস্ট করতাম। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে অর্ডার আসতে শুরু করে।" যাঁরা শাড়ির ব্যবসা শুরু করছেন, তাঁদের জন্য সায়নীর পরামর্শ, প্রথমেই অনেকটা স্টক না তোলাই ভাল। একই শাড়ি প্রচুর না তুলে বরং বিভিন্ন ডিজ়াইনের শাড়ি তুলুন একই টাকায়। তা হলে বুঝতে পারবেন, ক্রেতারা কোন ধরনের ডিজ়াইন বেশি পছন্দ করছেন। অল্প অল্প করে শাড়ি স্টক করুন এবং সেগুলো বিক্রি করতে থাকুন। শাড়ি যেন জমে না যায়।
শাড়ি সোর্স করা খুব কঠিন কোনও কাজ নয়। একটু ঘোরাঘুরি করতে হবে, খোঁজ রাখতে হবে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সায়নী জানালেন, "শান্তিপুর, ফুলিয়া বা ধনেখালিতে গিয়ে সরাসরি তাঁতিদের বাড়িতে যাওয়া যায়, তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়। শাড়ির দোকানে গিয়েও কথা বলতে পারেন। একবার যোগাযোগ তৈরি হলে শাড়ি তোলা কঠিন নয়। এখন আমি পাঁচ-ছ'জন তাঁতির সঙ্গে কাজ করি। সিল্কের জন্য কলকাতার বড়বাজার রয়েছে। তামিলনাড়ুতে প্রচুর তাঁতি আছেন, যাঁরা কাঞ্জিভরম, কাঞ্চীপুরম সিল্ক নিয়ে কাজ করেন। সার্চ ইঞ্জিন ঘাঁটলেও অনেক খোঁজ মেলে। তবে বাড়িতে বসেই সব খোঁজ পাবেন না। ঘুরতে হবে।" ব্যবসার টেকনিক্যাল দিকগুলোতেও নজর রাখুন। সরকারের তরফ থেকে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির উপর যা যা নিয়ম প্রযোজ্য রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকুন। জিএসটি, ট্যাক্স ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকুন। এ ছাড়া সকলেই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে নিজের কালেকশন দেখান ক্রেতাদের। খেয়াল রাখবেন, যে জায়গায় বসে লাইভ করছেন এবং আপনার নিজের চেহারা— দুটোই যেন দৃষ্টিনন্দন হয়। কথাবার্তা যেন মার্জিত হয়। লাইভ দেখে যদি ক্রেতাদের ইমপ্রেশন ভাল হয়, তা হলে তাঁদের শাড়ি দেখার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে।
শাড়ির ব্যবসা— ব্যাপারটা এখন অত্যন্ত কমন। নামী থেকে একদম 'হোমগ্রোন'— নানা ধরনের ব্র্যান্ড রয়েছে। সেখানে টিকে থাকতে গেলে কী করতে হবে? "ক্রেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে," বললেন সায়নী। "আমি শাড়ি প্যাক করার আগে খুব ভাল করে দেখি। যদি একটা ছোট দাগও থাকে, তা হলে ক্লায়েন্টকে জানাই যে দাগ থাকা সত্ত্বেও যদি উনি শাড়িটা নিতে রাজি থাকেন, তা হলে দাম কিছুটা কমিয়ে দেব। এ ছাড়া আমার যে ক্যাশ অন ডেলিভারির অপশন নেই, বা আমি ফ্রি শিপিং দিলেও, কেউ স্পিডপোস্টে ডেলিভারি চাইলে সেই টাকাটা যে তাঁকে দিতে হবে — এই জিনিসগুলো আমি আগেই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিই। স্বচ্ছতা বজায় রাখা খুব জরুরি। আর দামের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড বজায়

রাখতে হবে। খুব দাম কমিয়ে দিলেই শাড়ি বেশি বিক্রি হবে, এমন নয়— বরং ক্রেতারা অযৌক্তিক রকমের কম দাম দেখলেও কিন্তু শাড়ির মান নিয়েও নিশ্চিত হতে পারবেন না, ফলে কিনতে চাইবেন না! কিন্তু শুধু লাভ বাড়ানোর জন্য আকাশছোঁয়া দাম রাখলেও সকলে তা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন না। অযৌক্তিভাবে দাম কম রাখবেন না, কিন্তু মানুষের সাধ্যের মধ্যে রাখুন।'' আর নজর রাখুন 'আফটার ডেলিভারি সার্ভিস'এর দিকে। শাড়ি পাওয়ার পর তার ব্লাউজ়পিস, বা কীভাবে ধুলে শাড়ি ভাল থাকবে— এসব নিয়ে যদি ক্রেতাদের কোনও প্রশ্ন থাকে, সে ব্যাপারে তাঁদের সব রকম সাহায্য রাখুন। অনেক সময় ক্রেতাদের সঙ্গেও নানা রকম গণ্ডগোল হয়, ক্রেতা এবং বিক্রেতা দু'জনেই চ্যাটে নিজেদের অসন্তোষ জানান। কেউ কেউ এসব চ্যাটের স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেন। তাতে প্রচুর রিঅ্যাকশন, কমেন্ট পড়ে, প্রোফাইলের রিচ বাড়ে। কিন্তু এটা না করাই উচিত— কারণ চ্যাটটা আপনাদের ব্যক্তিগত। তা সর্বসমক্ষে নিয়ে এলে কোথাও ক্রেতাদের বিশ্বাসে চিড় খেতে পারে। এই জিনিসগুলো মাথায় রাখলে ক্রেতাদের সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক তৈরি হবে, তাতে আপনার ব্যবসারই লাভ হবে। এমনিতে ক্রেতাদেরও বাজার কিন্তু বিশাল! কোভিডের পর থেকে অনেক দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করার অভ্যেসও চলে গিয়েছে, অনলাইনে কেনাকাটা করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ তাঁরা। নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং ক্রেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে পারলে ব্যবসা বাড়বেই।


সায়নী সাহা

মার্কেটিংয়ের টুকিটাকি

নতুন স্টার্ট-আপে অনেকক্ষেত্রে বিজ়নেস স্ট্র্যাটেজির চেয়েও মার্কেটিং বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। শাড়ির গুণগতমান বা দাম সঠিক হওয়া জরুরি তো বটেই, তবে লোকে আপনার প্রডাক্ট সম্পর্কে জানতে পারছে কিনা, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। একদম ছোট স্কেলে যাঁরা ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন, তাঁদের পক্ষে প্রথমেই ওয়াইড মার্কেটে অ্যাপিল করা সম্ভব নয়। প্রথমদিকে তাই স্থানীয় লোকজনের মধ্যেই ব্র্যান্ডিং করা শুরু করুন। মার্কেটিং নিয়ে অল্পবিস্তর এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন। কোন ধরনের শাড়ি বা কোন প্রাইস রেঞ্জের শাড়ির কদর বেশি, সেগুলো লক্ষ করতে হবে। তবে কোয়ালিটির সঙ্গে আপস করে নয় কখনওই। অবন্তিকা'জ় বুটিকের কর্ণধার কাকলি বাগচীর কথায়, "কোয়ালিটি এবং সততার সঙ্গে কোনও কম্প্রোমাইজ় করা যাবে না। কারণ ক্রেতারা কিন্তু শুধু একটা বা দু'টো বুটিকের শাড়িই দেখছেন না। কোন শাড়ি ভাল, কোন শাড়ি নকল, সেগুলো তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। তাছাড়া ১৫০০ টাকা দামের হাতে বোনা খাদির শাড়ির কোয়ালিটি ৫০০ টাকা দামের শাড়িতে পাওয়া যাবে না কখনওই। অল্প দামের শাড়ি বিক্রি করায় সমস্যা নেই, তবে পাওয়ার লুমের শাড়িকে হাতে বোনা শাড়ি বলে বিক্রি করে ক্রেতাদের ঠকানো উচিত নয়। ক্রেতাদের সঙ্গে ট্রান্সপেরেন্সি বজায় রাখা একান্ত জরুরি। একই কারণে নিজেকেও শাড়ি সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করতে হবে, যাতে আপনাকেও কেউ ঠকাতে না পারে।" এখন শাড়ি ব্যবসায়ীদের সংখ্যা নিত্য বাড়ছে। তার মধ্যেও নিজের জায়গা তৈরি করে নিতে হলে অন্যদের চেয়ে কোথায় আপনার শাড়ি আলাদা, সেটাও স্পষ্ট করে তুলতে





একগুচ্ছ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করতে হবে, তেমনটা নয়। প্রতিযোগিতার বাজারে নিজের প্রডাক্ট যেন ইউনিক হয়। ইউটিউবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও আপলোড করুন। আপনার শাড়ির বিশেষত্ব, দাম তুলে ধরুন।

হবে। কিছু একটা বিশেষত্ব রাখুন। হয়তো আপনার শাড়ির দাম অত্যন্ত কম, বা কোনও বিশেষ ধরনের শাড়ি একমাত্র আপনার কাছেই পাওয়া যায়, বা দু'রকমের শাড়ির বিশেষত্ব মিলিয়ে আপনি সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের শাড়ি তৈরি করালেন তাঁতিদের দিয়ে... এবার সেই বিশেষত্ব ধরেই লোকের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। অনলাইন মাধ্যমের মতো সহজ এবং সাশ্রয়ী অপশন এই মুহূর্তে খুব কম রয়েছে। প্রথমে সেখান থেকেই শুরু করুন। বিভিন্ন সেলিং গ্রুপে লাইভ করতে পারেন। ইউটিউবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের পেজে ছোট ছোট ভিডিও আপলোড করুন। আপনার শাড়ির বিশেষত্ব, দাম তুলে ধরুন। কাকলি বাগচী এই প্রসঙ্গে বলছিলেন, "আমি ব্যবসা শুরু করার সময়ই ঠিক করে নিয়েছিলাম, পাওয়ার লুমের শাড়ি বিক্রি করব না। তাতে দাম যদি একটু বেশিও রাখতে হয়, তাই রাখব। ১০০০০ টাকা দিয়ে ১০-১২টা হাতে বোনা শাড়ি তৈরি করিয়ে শুরু করেছিলাম। প্রথম শাড়ি বিক্রি করি স্থানীয় এলাকায়। তারপর মনে হল, আরও বেশি সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছনো জরুরি। তখন তো সোশ্যাল মিডিয়া এতটাও জনপ্রিয় ছিল না। তাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার দপ্তরে যোগাযোগ করি। 'সানন্দা'য় একটি বা দু'টি শাড়ি ছাপা হয়। অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকেও ধীরে ধীরে ডাক পেতে থাকি। তখন থেকেই বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতেও যোগাযোগ করতে শুরু করি। এতে ব্র্যান্ড ভিজ়িবিলিটি অনেকটাই বেড়েছিল। তারপর ইউটিউবে চ্যানেল করে ভিডিও আপলোড করা শুরু করি। সত্যি বলতে, সেই থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি।"


কাকলি বাগচী

তবে রাতারাতি কোনও মার্কেটিং কৌশলই সাফল্য এনে দেবে না, এই কথাটাও মনে রাখা জরুরি। লোকের কাছে পৌঁছতে, ব্র্যান্ডনেম তৈরি করতে সময় এবং ধৈর্য প্রয়োজন। তাই ব্যবসার প্রতি প্যাশন থাকা আবশ্যক। এই বিষয়ে কাকলি বাগচীর বক্তব্য, "আমার বুটিক নাগের বাজারে। প্রায় ১২ বছর হয়ে গেল বুটিকের। আজ সুভাষগ্রাম থেকেও আমার শাড়ি কিনতে আসেন লোকে। বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় শাড়ি পাঠাই। এসব একদিনে হয়নি ঠিকই। তবে লেগে থেকেছি। এমনও দিন গিয়েছে, বুটিকে একজনও আসেননি। তখন হাল ছাড়িনি বলেই আজ 'অবন্তিকা'জ়' এই জায়গায় দাঁড়িয়ে। তবে আর-একটা কথাও না বললেই নয়, ব্র্যান্ড দেখে হয়তো মানুষ প্রথম শাড়িটা কিনবেন। কিন্তু দ্বিতীয় শাড়িটা নেবেন তখনই, যখন প্রথম শাড়ির কোয়ালিটি, দাম, ডিজ়াইন, তাঁর ভাল লাগবে। তাই প্যাশনের সঙ্গে ভাল জিনিস পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছেটাও থাকতে হবে পুরোদস্তুর। সেক্ষেত্রে সাফল্য আজ

না হোক, কাল আসবেই।”

ব্যবসা শুরুর পুঁজি

যে কোনও ব্যবসার শুরুতেই মূলধন বা পুঁজির বিষয়টি মাথায় রেখে এগোতে হয়। তবে শাড়ি ব্যবসায়ে সফল যাঁরা, তাঁদের মতে পুঁজি অল্প হলেও আত্মবিশ্বাস থাকলে আপনি সফল হতেই পারেন। প্রায় ১৭ বছর ধরে ব্র্যান্ড ‘স্বতন্ত্র’-র অন্যতম কর্ণধার ও ‘ছোটগল্প’র একক কর্ত্রী দেবপ্রিয়া লালী জানালেন, ‘‘আমি খুব অল্প মূলধন নিয়ে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ডিজ়াইনগুলো ভাল ছিল বলে ক্যাপিটাল রোলড হয়েছে সহজেই। ধরুন, কেউ যদি পাঁচটা পোশাক দিয়ে শুরু করেন, তাঁর এই পোশাক বিক্রি হতে বেশি সময় লাগবে না। যে মোট আয় হবে তা দিয়ে তারপর তিনি আটটা পোশাক বানান। এভাবে মূলধন বাড়বে। ধরুন, প্রথম পোশাক ১০০ টাকায় বানালেন, ১৫০ টাকায় বেচলেন। পরের প্রডাক্টে ওই ৫০ টাকা লাভও যোগ করে দিলেন। একে ‘প্লাওয়িং ব্যাক অফ প্রফিটস’ বলে। একগুচ্ছ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করতে হবে, তেমনটা নয়। প্রতিযোগিতার বাজারে নিজের প্রডাক্টটি যেন ইউনিক হয়। আমি মাত্র ৫০০০ টাকা নিয়ে নেমেছিলাম। স্টোর ছিল আমার। যদিও সেটা আমার বাড়ির লাগোয়া হওয়ায় হয়তো আলাদা করে ভাড়া দিতে হয়নি। কিন্তু খুবই সামান্য পুঁজি নিয়ে নেমে এতগুলো বছর প্রতিযোগিতায় উতরে গিয়েছি। স্টোরের ক্ষেত্রে একটু বেশি ঝুঁকি থাকে। স্টাফেদের দায়িত্ব, স্টোর চালানোর খরচ ইত্যাদি থাকে। প্রথমে মার্কেট সার্ভে করে দেখুন আদৌ আপনার প্রডাক্ট লোকে কিনবেন কিনা। আমি ১৭ বছর আগে শুরু করেছিলাম, তখন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ছিল না। এখন আমার দ্বিতীয় ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে আমি অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়েছি। অনেকটা কস্ট কাটিং করা সম্ভব। প্রডাক্টে কিছু ইনভেস্ট করলেন, ফোন রাখলেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকলেন...ব্যস তাহলেই হবে। অল্প অল্প করে পেজ বুস্ট করতে থাকলে প্রাথমিকভাবে ডিমান্ড তৈরি করা যাবে। প্রডাক্ট কপি হয় প্রচুর। কিন্তু আপনাকে নিয়মিত নিজেকে ইভলভ করতে হবে।


দেবপ্রিয়া লালী

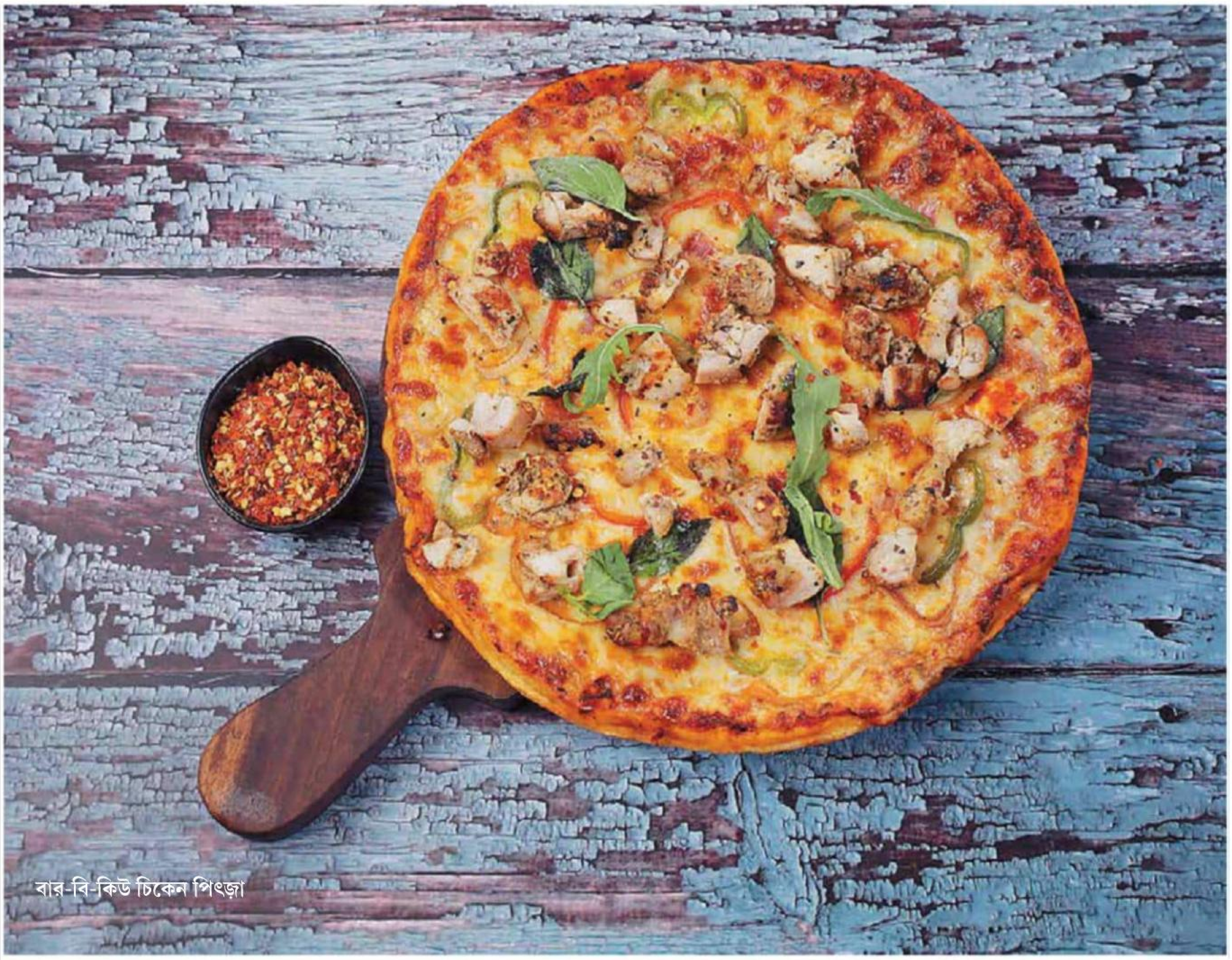
মূলধন ছাড়া ট্রেড লাইসেন্স ও জিএসটির বিষয়ে জানা জরুরি। আমার একটু সুবিধে ছিল কমার্সের ছাত্রী ছিলাম বলে! প্রতি মাসে জিএসটি রিটার্ন করতে হবে। তবে নিজে না বুঝলে আইনি দিকগুলোর জন্য একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টের পরামর্শ নিতে হবে।’’

তবে দেবপ্রিয়ার মতে, ব্যবসার শুরুতেই লাভের কথা ভাবলে মুশকিল। বিশেষত পোস্ট কোভিড সময়ে। ‘‘কেউ যদি শুরুতেই প্রচুর টাকা লাভের কথা ভাবেন, তাহলে সেই অ্যাপ্রোচ একেবারেই সঠিক নয়। প্রথমে ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তিনি যদি খুশি হন, ফের আসবেন। অন্তত দু’-তিনবছর সময় দিন। এই দু’তিনবছর রিটার্নের কথা ভাববেন না। একটু একটু করে লাভ করবেন। কিন্তু স্টেডি হওয়া জরুরি। আর এখন কোভিডের পরে মানুষ অনলাইনের উপরে অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তাই, প্রতিযোগিতাও বেড়েছে। শুরুতে নিষ্ঠাভরে ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করুন। মূলধন যাতে রোলড হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। তাহলেই ব্যবসা ধীরে ধীরে বাড়বে।’’

লেখা: সায়নী দাশশর্মা, সংবেত্তা চক্রবর্তী, মধুরিমা সিংহ রায়

ছবি: আইস্টক





বার-বি-কিউ চিকেন পিৎজ়া

পাস্তা থেকে পিৎজ়া। সাধারণ প্রসেসে অসাধারণ রান্নার খোঁজ দিলেন বোহো দ্য গ্রাউন্ড কাফের কর্পোরেট শেফ অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়।



কথায় বলে ‘যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে’। রোজকার দশটা-পাঁচটার জীবনে দৌড়তে গিয়ে বাড়ির রান্না সেই ‘ডাল-ভাতে’ সীমিত। স্বাদ-বদলের একমাত্র উপায় হোটেল, রেস্তরাঁ অথবা অনলাইনে অর্ডার। অথচ স্বাদ-বদলের সব উপকরণই কিন্তু ঘরে হাজির। একটু নেড়েচেড়ে দেখলে ঘরোয়া উপকরণেই হতে পারে লা-জবাব সব রান্না। কোভিড-কালে বাড়িতে প্রায় সকলেই কম-বেশি রান্নায় হাত পাকিয়েছেন। এবার একধাপ এগিয়ে নতুন কিছু করা যাক! বার-বি-কিউ থেকে তন্দুরি, পিৎজ়া থেকে পাস্তা— হাতা-খুন্তির ঠোকাঠুকিতে বানিয়ে ফেলা যায় এ-গ্রেড সব রান্না। সানন্দার আজকের পাতায় রইল তেমনই কিছু রান্নার হদিশ।

বাফেলো উইংস

উপকরণ: চিকেন উইংস ৬ পিস, বার-বি-কিউ সস ৪ টেবলচামচ, চিলি ফ্লেক্স ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, গোলমরিচ ১/২ টেবলচামচ, তেল ১০০ মিলি, লেবুর রস ২ টেবলচামচ, রিফাইন্ড ময়দা ১০০ গ্রাম, রসুনকুচি ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবলচামচ।



প্রণালী: আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন উইংসে ময়দা মাখান। ছাঁকা তেলে ভাজুন। ভাজা হলে তেল ঝরিয়ে নিন। এবার অন্য একটি প্যানে তেল গরম করুন। তাতে পেঁয়াজ ও রসুনকুচি লাল করে ভাজুন। এরপর বার-বি-কিউ সস দিন ও প্রয়োজনীয় মশলাপাতি দিয়ে নাড়ুন। প্যানে সস সম্পূর্ণভাবে তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সস সঠিক ঘনত্বে পৌঁছে গেলে চিকেন উইংস ফেলে কিছুক্ষণ এপিঠ-ওপিঠ করে নামিয়ে নিন। একটি পাত্রে ঢেলে গরম গরম পরিবেশন করুন বাফেলো উইংস।



বাফেলো উইংস

মোজ়ারেলা স্টিক

উপকরণ: স্প্রিং-রোল-শিট ২ পিস, মোজ়ারেলা চিজ় ৭৫ গ্রাম,

আমুল চিজ় ২০ গ্রাম, চিলি ফ্লেক্স ১/২ টেবলচামচ, রোস্টেড চিলি ফ্লেক্স ১/২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, লাল-হলুদ-সবুজ ক্যাপসিকামকুচি ১/২ টেবলচামচ, পার্সলেকুচি ১ টেবলচামচ। ডিপের জন্য: টোম্যাটোকুচি ২ টেবলচামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবলচামচ, টোম্যাটো-কেচাপ ৩ টেবলচামচ, টোব্যাস্কো সস ২ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি ১ টেবলচামচ, লেবুর রস ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, গোলমরিচ ১/২ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ২ টেবলচামচ।

প্রণালী: প্রথমে একটি পাত্রে মোজ়ারেলা চিজ় ভালভাবে ম্যাশ করুন। তাতে সমস্ত উপকরণ (মশলা ও অন্যান্য উপাদান) পরিমাণ অনুযায়ী যোগ করুন। স্প্রিং-রোল-শিটের সাহায্যে রোল করুন। জুলিয়ান শেপে কাটুন। এরপর একটি প্যানে তেল গরম করুন। গরম হলে ছাঁকা তেলে ভেজে নিন। ডিপের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মেশান ও ফুটতে দিন। ঠান্ডা হয়ে এলে পরিবেশন করুন।


মোজ়ারেলা স্টিক

বার-বি-কিউ চিকেন পিৎজ়া

উপকরণ: ময়দা ২ কাপ, চিনি ২ টেবলচামচ, নুন ১/২ টেবলচামচ, শুকনো ইস্ট ১/২ টেবলচামচ, ইটালিয়ান সিজ়নিং ১ টেবলচামচ, চিকেন ১০০ গ্রাম, ক্যাপসিকাম ২০ গ্রাম, রকেট লেটুস ২ গ্রাম, মোজ়ারেলা চিজ় ১০০ গ্রাম।

প্রণালী: শুকনো ইস্ট, নুন, চিনি ও ইটালিয়ান সিজ়নিং দিয়ে মণ্ড তৈরি করুন। ৩০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। টপিংয়ের জন্য চিকেন ও অন্যান্য উপকরণ যোগ করুন। ১৮০ ডিগ্রি টেম্পারেচারে আগে থেকে আভেন গরম করে নিন। এরপর মণ্ডগুলোকে আভেনে দিয়ে ৩২০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৮ মিনিট রেখে দিন। আভেন থেকে বের করে নিলেই তৈরি বার-বি-কিউ চিকেন পিৎজ়া।

পেস্টো পাস্তা

উপকরণ: পেনপাস্তা ৯০ গ্রাম, ব্যাসিল লিফ ৬০ গ্রাম, পারমেসান চিজ় ১০ গ্রাম, পাইন নাট ১০ গ্রাম, আদা ১০ গ্রাম, অলিভ অয়েল ১০ মিলি, ক্রিম ১০ মিলি।

প্রণালী: পরিমাণমতো জলে পাস্তা ফোটান। জল ঝরিয়ে রেখে দিন। সস তৈরির জন্য প্রথমে একটি আলাদা পাত্র নিন। মিক্সিতে একে একে ব্যাসিল লিফ, পারমেসান চিজ়, পাইন নাট ও আদা একসঙ্গে গ্রাইন্ড করুন। এরপর একটি প্যানে তেল গরম করুন। তাতে আদাকুচি লাল করে ভাজুন। পাস্তা ও পেস্টো সস দিয়ে ভালভাবে নাড়াচাড়া করুন। গার্নিশিংয়ের জন্য উপর থেকে পারমেসান চিজ় ছড়িয়ে দিন। একটি পাত্রে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন পেস্টো পাস্তা। ঘরে তৈরি পেস্টো পাস্তার স্বাদ চেখে নিন সপরিবারে।

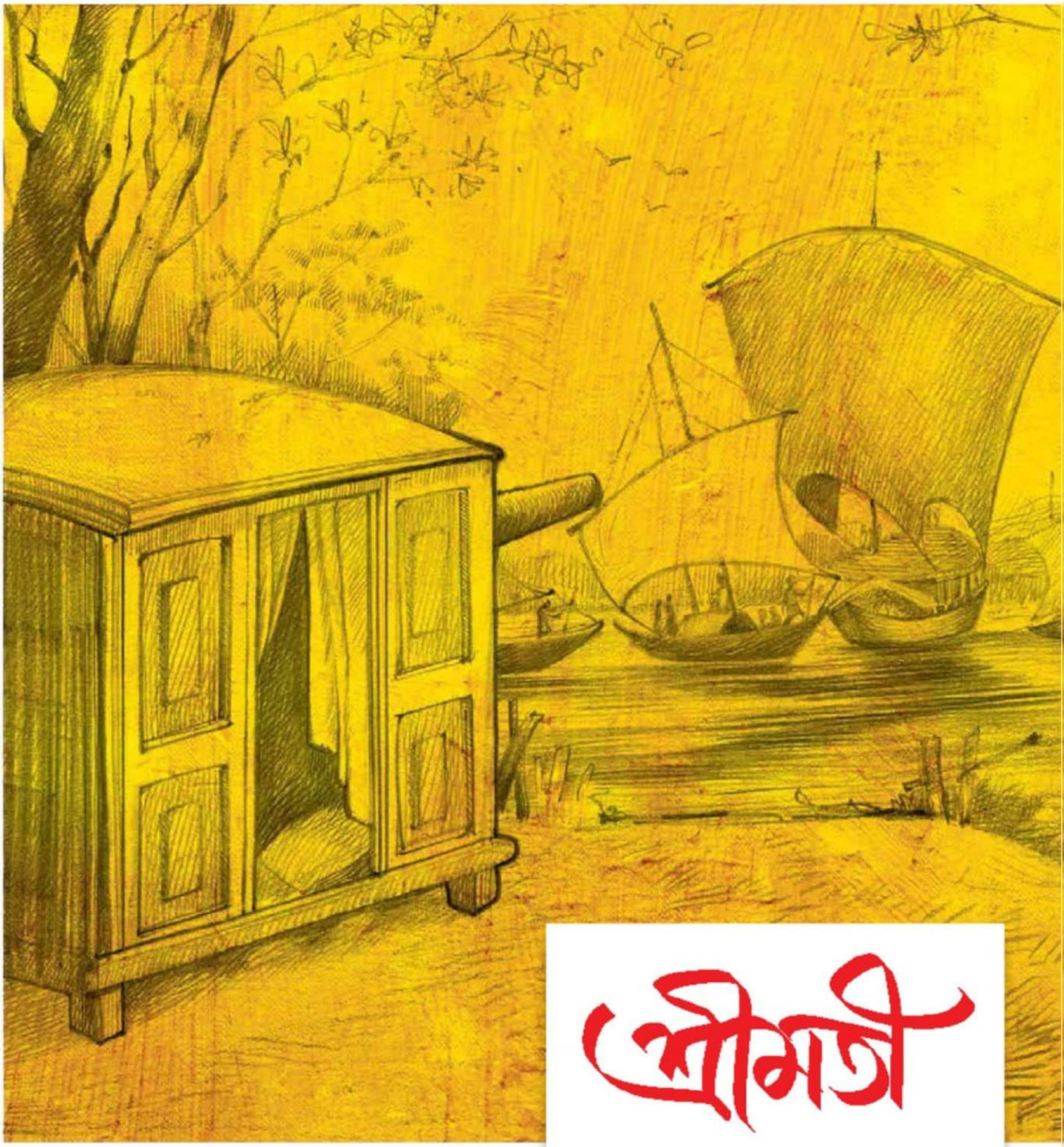

পেস্টো পাস্তা



গোলমরিচে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ় থাকে যা ক্যালরি বাড়ায়, হাড় শক্ত করে, ক্ষত নিরাময়ে দ্রুত সাহায্য করে ও বডি মেটাবলিজ়ম বাড়ায়।

তা হলে পিৎজ়া হোক বা পাস্তা, চিজ় হোক বা চিকেন উইংস— পাঁচতারা হোটেলের রকমারি রান্নার বেশ কিছু এখন আপনার হাতের মুঠোয়। তবে আর ভাবছেন কী? ঘরে থেকেই যখন সম্ভব অসাধারণ রান্নার কারিগরি, মাছে-ভাতে বাঙালির ভিন্ন ধারার রান্নার শুরুটা তবে এভাবেই হোক!

যোগাযোগ: ৯৩৩০৩৯৩৯০৬



শ্রীমতী

তাপস রায়

আগের ঘটনা

নিধুবাবুকে নিজের অতীত জীবনের কথা, কী করে মহানন্দর সঙ্গে আলাপ হল— সব বলে শ্রীমতী। মহানন্দর যে টাকা তার কাছে রয়েছে, তা বিনিয়োগ করার ব্যাপারে পরামর্শও চায়। নিধুবাবু বলেন, তিনি শ্রীমতীকে একটা বাজার কেনার ব্যবস্থা করে দেবেন। নিত্যানন্দ হরু ঠাকুরের কাছে গিয়ে, নিধুবাবুর প্রতিপত্তি কমানোর নানা বুদ্ধি দিতে থাকে। কিন্তু তাকে পাত্তা দেন না হরু ঠাকুর। তারপর...

{৫}

কুলুই সেনের আত্মীয় নিধুকে যে হরু ঠাকুর প্রীতির চোখে দেখেন, তা নয়। কিন্তু গানটা যে বড় খাসা বাঁধে নিধু। আর লেখাপড়া জানা মানুষ সে। কত শাস্ত্র পড়েছে। গান শিখেছে ওস্তাদ রেখে। শুধু তো আখড়াই গান নয়, সে যা টপ্পাগীতি লেখে আর গায়, তা তো



অতুলনীয়। হরু বয়সে বড় হলেও নিধুর দেখাদেখি গান লিখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেবল মনে হয়, না, নিধুর মতো হল না। নবকৃষ্ণের সভায় এই রামনিধির মামা কুলুই সেনের একাধিপত্য হরু ঠাকুরই খর্ব করেছিলেন একসময়। তার আগে তো নবকৃষ্ণর কুলুই সেনকে নিয়ে কী মাতামাতি! কুলুই সেনের মতো ওরকম আখড়াই নাকি এর আগে কখনও লেখা হয়নি। বাড়ির বউ-ঝিকে চিকের আড়ালে বসিয়ে তো শুধু খেউড় শোনানো যায় না! নবকৃষ্ণ বলতেন, কুলুইচন্দ্র সেন নাকি শান্তিপুরের খেউড়ের মৃত্যু ঘটিয়ে আখড়াই গানকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

নিত্যানন্দ রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর হরুর মনে পড়ছে কত কথা। হ্যাঁ, নিত্যানন্দ তাঁর আখড়াই দলে দোহারের কাজ করত। রাজা নবকৃষ্ণ মারা গেলে তিনি দল ভেঙে দিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর আসরে গান গাইবেন না। যে মানুষটির বিনোদনের জন্য তিনি গাইতেন, সে-ই নেই, তো গেয়ে কী হবে! নিত্যানন্দ কেন, রাজা নবকৃষ্ণের ছেলে রাজকৃষ্ণ কতদিন অনুরোধ করেছে দল নিয়ে আবার আসরে নামতে। তা-ও নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসেননি হরু ঠাকুর।

সাত-আট বছর তো হয়ে গেল রাজা নবকৃষ্ণ মারা গেছেন। এখনও হরু মনে করতে পারেন সেদিনের কথা। নবকৃষ্ণ একবার তাঁর সভার কবিদের কবিত্বের প্রমাণ নিতে একটি বাক্যাংশ দিয়ে বলেন, আগের অংশটুকু পূর্ণ করুন তো কবিগণ! কেউই পারেননি। শেষে গঙ্গার ঘাট থেকে গামছা কাঁধে হরু ঠাকুরকে ধরে আনা হল। নবকৃষ্ণ বললেন, "কই হে ঠাকুর, তোমার জন্যই বসে আছে সকলে। বলো তো কবিয়াল, শেষ চরণে থাকবে 'বঁড়শি গিলেছে যেন চাঁদে'। এর আগের চরণ কী হবে?"

হরু ঠাকুর গামছা এ কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে ফেলতে যতটুকু সময়, তার ভিতর পদ পুরণ করলেন।

"একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি, ধুলায় পড়িয়া বড় কাঁদে
রানি অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, বঁড়শি গিলেছে যেন চাঁদে।।"

নবকৃষ্ণ সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে দিতে বললেন, "সাধু সাধু। দেখলেন রসিকজন, আমি কি এমনি এমনি হরু হরু করি!"

কুলুই সেন সহ সমবেত সকলকেও সাধু সাধু বলতে হয়েছিল যে তখন। হরু ঠাকুর ওই আনন্দধ্বনির ভিতর বললেন, "রাজাবাহাদুর, আমি তবে যাই। আমার চানের বিলম্ব হয়ে যায়।"

"কোথায় যাবে ঠাকুর! পুরস্কার নিয়ে যাও।" নবকৃষ্ণই হরেন্দ্রকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গীকে এই হরু ঠাকুর নাম দিয়েছেন। কবিদের মধ্যে আর কেউই যে ব্রাহ্মণ নয়। একমাত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণই ব্রাহ্মণ। মানে ঠাকুর। তিনি ঠাকুর বলে সম্বোধন করে বামদিকে ফিরে সরকারমশাইকে বললেন, "সরকারমশাই, দপ্তরিখানায় গিয়ে বলুন, হরু ঠাকুরকে একহাজার টাকা পুরস্কার দিতে হবে। "

হরু ঠাকুরকে তেল-মাখা চাঁদি নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকতে হল। আর তিনি সেই ভুল করতে চান না। সেবার তো প্রাণ বিপন্ন হতে বসেছিল! প্রথম গান করতে এসেছিলেন হরু ঠাকুর নবকৃষ্ণ দেবের প্রাসাদে। তাঁর গানে সন্তুষ্ট হয়ে নবকৃষ্ণ একজোড়া শাল উপহার দিলে, হরেকৃষ্ণ সেই শাল ঢুলির মাথায় ছুঁড়ে মেরেছিলেন। নবকৃষ্ণ তাঁকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েও শরীরে ঝোলানো উপবীত দেখে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

রাজকৃষ্ণ দেব রাজাবাহাদুরের বাড়িতে আবার আমন্ত্রণ এসেছে। গানের লড়াইয়ের বিচার করতে হবে। হরু ঠাকুর তো যাবেনই। নিজের

গানের দল ভেঙে গেলেও গানের লড়াইয়ের বিচারক হিসেবে এ বাড়ি-ও বাড়ি তাঁর ডাক পড়ে। আর তাতে ঘটি-গাড়ু প্রণামীর সঙ্গে আসে টাকাকড়িও। গান না গাইলেও, এই কাজটা করতে তো আর প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হয় না। উলটো দিকে সংসারটা ভাল করে চলে। হরু ঠাকুর শুনেছেন, রাজা রাজকৃষ্ণের আসরে আখড়াই গানের লড়াই হবে দুটো দলে। বাগবাজার আর জোড়াসাঁকোর দলের ভিতর। বাগবাজারের দলের পান্ডা নাকি রামনিধি। সে আখড়াই গানের দল খুলেছে। সিমলে, পাথুরিয়াঘাটা, বড়বাজার— সব বড়লোকের বাড়িতে গানের লড়াই দেখতে লোক ভেঙে পড়ছে। হালসিবাগানের পেশাদারি গানে আর ভিড় হচ্ছে না। তাই তো নিত্যানন্দের অমন রাগ রামনিধির উপরে।
বন্ধু রসিকচাঁদের কথায় দল গড়ে এদিক ওদিক গাহনা দিয়েছেন বটে রামনিধি, কিন্তু দেববাড়িতে গানের লড়াই খুব মর্যাদার। বাগবাজারে রসিকচাঁদের বাড়িতে মহড়া চলছে। গোপন রাখা হয়েছে ব্যাপারটা। ভবানী অংশের গান তো মোটামুটি এক। কিন্তু চিতেন বা ফুক বিরোধীরা জেনে ফেললে মুশকিল। দরাজা বন্ধ থাকে। রামনিধি তাঁর পক্ষীকুলের দু'জনকে দারোয়ান হিসেবে লাগিয়েছেন। এরা দু'জন হল শুকপাখি আর কুক্কুট পাখি। এদের নিজেদের সঙ্কেত ভাষা আছে। যে ভাষা রামনিধি জানেন।

"জানো শ্রীমতী, বড় সংশয়ে আছি। তোমার উৎসাহে তো নেমে পড়লাম, কিন্তু দেখছি এতে খুব আকচাআকচি। এ ওকে দেখতে পারে না, সে তাকে সন্দেহ করে। এর ছোট আসন, ওর বড় আসন। তাল সামলানো খুব মুশকিল! নিজের গানের তো দফারফা হচ্ছে। এই তোমার কাছে এসে দু'দণ্ড ফুরসত আর মনের আরাম। আর গান এখানেই যতটুকু হয়। তোমার দাসী আলতাবালাকে বলো তো একটু কড়া করে চিৎপুরি তামাকে গড়গড়া সাজতে। আর মিঠে মদ দিও না আজ। একটু বেশি জ্বালাধরা মদ দিও।"

"সে না হয় হল। কিন্তু বাবু, তুমি আজ এত অস্থির হয়ে আছ কেন? শরীরে কোনও ব্যামো বাসা বাঁধেনি তো!"

"না হে প্রাণনিধি। ব্যামো আমার থেকে সাতহাত দূরে থাকে। সকাল সকাল আখড়ায় মুগুর ভাঁজা যদি দ্যাখে, ব্যামো দোরগোড়া থেকে পালাবে। তারপর গঙ্গায় সাঁতার কাটাও আছে বেশ খানিক। পরিমিত আহার করি। দোষনীয় বলতে তোমার এখানে এসে একটু মদ সেবন করা। তা ওটুকু না হলে যে আমি পারিনে! আমার গান আসে না।"

"তা তো আমি জানি বাবু। কিন্তু তুমি এতখানি বিচলিতও কখনও হও না। তুমি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আজ তো নতুন ঘর করছ না! তোমার ওই গাঁজাড়ু পক্ষীকুলকে সামলাতে বেগ পেতে হয়নি, অথচ মার্জিত, গুণী শিল্পীদের নিয়ে তোমার সমস্যা হচ্ছে, এ বড় আজব ব্যাপার! তুমি আসল কথা বলো তো! তোমাকে বিব্রত দেখতে আমার ইচ্ছে করে না। দেখিওনি আগে।"

"তা হলে শোনো শ্রীমতী —
মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব কার দোষ দিব নিলে
কোনজন।
না বলে কেমনে রব বলে বল কী করিব।
তোমা বিনে আর সেখানে কাহার
গমনাগমন।।



বাগবাজারে রসিকচাঁদের বাড়িতে মহড়া চলছে। গোপন রাখা হয়েছে ব্যাপারটা। ভবানী অংশের গান তো মোটামুটি এক। কিন্তু চিতেন বা ফুক বিরোধীরা জেনে ফেললে মুশকিল।

অন্যের অগমনীয় জান সে স্থান নিশ্চয়।
ইথে অনুমান এই হয় প্রাণ তুমি সে কারণ।।
যদি তাহে থাকে ফল লয়েছ করেছ ভাল।
নাহি চাহি আমি যদি তুমি প্রাণ করহ যতন।।"

"বাবু, আজ তো দেখছি মদ সেবা না নিয়েই তুমি গান বানিয়ে ফেললে! আহা, খুবই মধুর হয়েছে গো!"

"না শ্রীমতী, এ গান অনেক পূর্বের রচনা। আজ নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। তাই পুরনো গান গেয়েই নিজেকে শান্ত করলাম।"

"কী হয়েছে বাবু, বলো, আমাকে বলো।"

শ্রীমতী রামনিধির আরও কাছে গিয়ে বসল। তার বামহাতটি নিজের দু'হাতের ভিতর নিয়ে তাতে আশ্লেষ দিতে লাগল।

"দ্যাখো শ্রীমতী, আমার বড় ছেলে মারা যাওয়ায় আমি এতটা বিচলিত হইনি। কিন্তু আমার বড় মেয়েকে আমি খুবই পছন্দ করতাম। বাড়ি থাকলে সে আমার কোলেপিঠে ঘুরে বেড়াত। তাকে নিজের থালা থেকে পাশে বসিয়ে খাওয়াতাম। আজ সে আমাকে ছেড়ে অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এরকম হয়েছিল অনেক বছর আগে, যখন আমার প্রথম পক্ষ আর তার কোলে আসা আমার প্রথম পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল। তখনই এই গানটা কেদার রাগে বেঁধেছিলাম।"

কথা বলতে বলতে দীর্ঘ শালপ্রাংশু চেহারা যেন অনেকটা নুয়ে এসেছে। শ্রীমতী কী সান্ত্বনা দেবে সন্তানহারা বাবাকে! তার নিজেকেও খুবই অসহায় লাগছে। সে রামনিধির গায়ের ভিতর ঢুকে এসে তাঁর কাঁধে মাথা রাখে। রামনিধির একটা হাতের উপর নিজের হাত বোলাতে লাগল।

রামনিধি বললেন, "জানো শ্রীমতী, মৃত্যু সারাজীবন আমাকে এমনভাবে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে, আমি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসজীবন নিতে গিয়েছি বারবার। কিন্তু আমার গুরুজি ভিখনরাম স্বামীজি আমাকে বার বার পিছনে টেনেছেন। তাঁর আদেশ আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। তাই তো রয়ে গিয়েছি সংসারে।"

"বাবু, তোমার গুরুদেব তো মহান। তিনি তো ইচ্ছে করলে তোমাকে দলে ভিড়িয়ে সন্ন্যাসী করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেখেছিলেন এই সংসারে তোমার অনেক কিছু দেওয়ার আছে। তুমি যদি বিহারের ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গে থাকতে, আজ বাংলার গীতবাদ্যপ্রেমী মানুষ কত কিছু হারিয়ে ফেলত, তাই না!"

রামনিধিও আজ আশ্রয় চাইছিলেন। বললেন, "আজ প্রথম আমার তৃতীয় পক্ষ মুখ খুলেছে। ঠিকই বলেছে। সে বলেছে, বদ্যিবাড়ির ছেলে কোথায় মানুষের সেবায় লাগবে, না শহরের বখে যাওয়া ছেলেপিলে নিয়ে, গান-বাজনা, মেয়েছেলে নিয়ে মেতে আছে! মেয়েটা বাবা বাবা বলে ডাকতে ডাকতে জ্বরের ঘোরে প্রাণবায়ু বের করে দিল। উনি বাগবাজারে বসে গানের মহড়া দিচ্ছেন! কতবার লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু সেখানে দু'জন ধেড়ে মানুষ কিছুতেই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। মেয়েটা চলে যাওয়ার আগে বাবার মুখটা দেখে যেতে পারল না! এমন আমার পোড়া কপাল!"

শ্রীমতী রামনিধির বক্ষলগ্ন ছিল। সে ছিটকে উঠল। "সে কী! রসিকচাঁদের বাড়ির দারোয়ান তো খুবই খারাপ কাজ করেছে। মরার সময় মেয়েটা বাপের মুখ দেখতে পেল না গা!"

"না শ্রীমতী। দোষটা আমারই। এই যে জোড়াসাঁকোর সঙ্গে গানের লড়াই বাগবাজারের, তা দেখতে গিয়েই তো কাণ্ডটা ঘটল। জোড়াসাঁকোর দল গুপ্তচর পাঠিয়ে আমাদের দলের খোঁজখবর শুধু না, দল ভাঙাতে পর্যন্ত চেয়েছে। ওরা বেহালাবাদক রাধানাথ সরকার আর সেতারবাদক মাধবচন্দ্র

ঘোষকে ওদের দলে ভেড়াতে চায়। অনেক টাকা নিয়ে একদিন হাজির হয়েছিল। আমার পক্ষীদলের ছেলেরা কিছু একটা সন্দেহ করে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তারপর থেকে ওই বাড়ির গেট পাহারা দেয় আমার পাখি। গতকাল দুটো খুব বদমেজাজের পাখি ছিল। শুকপাখি আর কুক্কুটপাখি। কাউকে কাছে ঘেঁষতে ওরা দেয় না।"
রামনিধির উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখ অপরাধবোধ আর শোকের সম্মিলিত আঘাতে অন্ধকার হয়ে আছে। শ্রীমতী ভেবে পায় না, কীভাবে রামনিধির অশান্ত মনকে শান্ত করবে। সে বলল, "বাবু, আজ বাড়ি ফিরো না। এখুনি বাড়িতে গেলে ঘরে মেয়েকে না দেখে যেমন মেয়ের ব্যথায় তুমি কাতর হতে থাকবে, তেমনি তোমার স্ত্রী তোমাকে বিলাপ করতে করতে কথা শোনাবে। তোমার আত্মা রক্তাক্ত হবে। আজ এখানে থেকে যাও। আমি গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেব। মদের গ্লাস তোমার সামনে অনেকক্ষণ বসে আছে, ওর প্রতি একটু দৃষ্টি দাও তো!"
শ্রীমতী চাইছে ভেঙে পড়া মানুষটিকে অন্য কথায় ভুলিয়ে রাখতে। শ্রীমতী নিজে জানে এই শোকের মানে। সে সারা জীবন যখন যাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছে, সেই তার কাছ থেকে সরে গেছে। বাবা, মা, স্বামী হারানোর পর তার জীবনদাতা মহানন্দ রায়ও চলে গেলেন। কত আর বয়স হয়েছিল! পঞ্চাশের মতো। অত সুন্দর স্বাস্থ্য তাঁর, কিন্তু তাকে না বলেই চলে গেলেন। যেভাবে এলাহাবাদে বলা নেই কওয়া নেই, তার স্বামী দুম করে মারা গিয়েছিল। শ্রীমতীর ভয় লাগে। তার নিধুবাবুর কিছু একটা হয়ে যাবে না তো! মদের গ্লাসে চোঁ চোঁ করে চুমুক দিলেন রামনিধি। কথায় আলুথালুভাব এসেছে। স্বর ভাঙা। বললেন, "বলো শ্রীমতী, আমার ভাগ্নে দু'জন যদি বাড়িতে থাকত, এমন দুর্দিন আমাকে দেখতে হত! ওরা তো কুমোরটুলিতেই থাকত। আমাদের বাড়িতেই। মস্ত কবিরাজ হয়েছিল দু'ভাই। ওরা থাকলে আমার মেয়েটা মরত? একদমই না। ওদের তখনই কী নাম! আমার দুই ভাগ্নে গুরুচরণ কবিরাজ আর গুরুদাস কবিরাজ ঝপ করে মরে গেল। আমার বুকের দু'দিক থেকে দু'খানি পাঁজর ভেঙে গেল। আমার সব শক্তি কে যেন কেড়ে নিল। জানো তো, আমার দুই স্ত্রী আর এক ছেলে মারা গেলেও আমি এতখানি কষ্ট পাইনি, যতটা ওই দুই ভাগ্নে মারা যাওয়ায় হয়েছিল। শ্রীমতী, আমি আর সংসারে মন বসাতে পারিনি। ঘর আমার পর হয়ে ছিল। তুমি আমার জীবনে না এলে আমি যে কোথায় কোথায় ভেসে বেড়াতাম, কে জানে!"
রাজা মহানন্দ না থাকলেও ঘর জুড়ে মহানন্দের ছায়া। শ্রীমতী দিনের বেলাতেই আসতে চায় না এই ঘরে। তার গা ছমছম করে। দোতলার জাফরি দেওয়া ঝুলবারান্দার খুব কাছেই এক বিরাট আমগাছ। বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে সে গাছের পাতায় হাত দেওয়া যায়। একটু দূরেই একটা বড় পুকুর। তারপর কিছু কলাগাছের বাগান। বাগান শেষ হতেই ইটের বাউন্ডারি। মহানন্দ গরাণহাটার এ বাড়ি বানাননি। এ রকমই জমিসহ কিনেছিলেন এক শেঠের কাছ থেকে। শেঠের তাঁতের ব্যবসায় বেশ কিছু টাকা লাগাতে হবে বলে বিক্রি করেছিল। ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছে দাসী আলতাবালা। তা-ও শ্রীমতী রামনিধির বাহু আঁকড়ে, মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না। আমের একটা ডাল হাওয়ায় নড়ে উঠলে ওর মনে হবে রাজা মহানন্দ রায় হয়তো এসে বসলেন ওই ডালে। শ্রীমতীর স্বামী মারা যাওয়ার পর এরকম মনে হত। হয়তো মাঝরাতে ঘরের চালের মটকায় পেঁচা ডেকে উঠল। শ্রীমতীর মনে হত, তার স্বামী হয়তো পেঁচার কণ্ঠে তাকে ডাকছে।
ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। তার বুক ঢিপঢিপ করছে। ঘরের অল্প আলোয় ডান দিকের দেওয়ালে থাকা মাথায় উষ্ণীষ, গলায় মুক্তোর মালা— মহানন্দ রায় যেন ছবির ভিতর থেকে শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এই অয়েলপেন্টিংটা আগের বার পার্কস্ট্রিটের এক পেন্টারকে দিয়ে আঁকিয়ে ফ্রেমবন্দি করে নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীমতীই চেয়েছিল। নমাসে-ছ'মাসে মহানন্দ রায় আসেন। কিন্তু শ্রীমতীর চলবে কী করে! তাই ছবি চাওয়া। এখন সেই ছবিই কি ভয় দেখাচ্ছে!
শ্রীমতী রামনিধিকে পালঙ্কের উপর বসিয়ে দিয়ে দরজার কাছে ফিরে এল। দরজা বন্ধ করতে করতে পিটপিট করে একবার চাইল। জ্বলজ্বল করছে উষ্ণীষ। খুবই নিখুঁত এঁকেছে শিল্পী। রাজা বলেছিলেন, সাহেব আঁকিয়ে। খুব চড়া দাম তার। এই ছবিটার দাম হাজার টাকা। সে হোক, ভাল কাজের জন্য ভাল দাম দেওয়াই যায়। রাজার নাকের নীচে তীক্ষ্ণ গোঁফের প্রান্তদু'টি মনে হচ্ছে, হাওয়া এলে উড়বে। শ্রীমতী নিজের বুকের উপর খানিক থুথুড়ি কাটল। না, তিনি ভয় দেখাবেন কেন শ্রীমতীকে। তিনি তো শ্রীমতীকে খুব ভালবাসতেন। এমনকী তাঁর মৃত্যুর পরও নিয়মিত মাসোহারা যেন আসে, তার ব্যবস্থা আগাম করে গিয়েছেন। এ মাসেও মহানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়কৃষ্ণ কাছারির লোক মারফত ৫০০ টাকা মাসোহারা পাঠিয়ে দিয়েছেন।
ছবির দিকে তাকিয়ে এই প্রথম শ্রীমতীর বুকের ভিতর থেকে দলা দলা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল। একজন বিধবা অসহায় মেয়েমানুষকে তিনি শুধু বেঁচে থাকতে দেননি, সম্মানও দিয়েছেন। সমাজের একজন প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব, মুর্শিদাবাদের নিজামতের দেওয়ান, তাঁর কী এমন ঠেকা পড়েছিল মৃত্যুর পরেও মাসোহারার বন্দোবস্ত করে যাওয়ার! এই প্রাণের মানুষটিকে হারিয়ে ফেলল শ্রীমতী। বুকের ভিতর হাহাকারে ভরে আসছে। এর পরে যদি সে নিজেকে না সামলাতে পারে! শ্রীমতী আঁচল মুখে গুঁজে দরজায় খিল তুলে দিয়ে পালঙ্কের উপর শুয়ে থাকা রামনিধির বুকে নিজেকে আছড়ে ফেলল।
রামনিধি নিজের ভিতর খন্ডিত হচ্ছিলেন। প্রথম পক্ষের ছেলে মারা যাওয়ার পর তাঁর দুই স্ত্রী গত হয়েছেন। এই তৃতীয় পক্ষেরও প্রথম ছেলে গত হয়েছে। আজ মেয়ে মারা গেল। তবে কি তাঁর জীবন অভিশপ্ত? রামনিধি চোখ বন্ধ করে ভাবছিলেন, কী এমন পাপ কাজ করেছেন এ জীবনে! ভাবনা বেশি দূর গড়াতে পারেনি। রামনিধি দেখলেন শ্রীমতীর চোখ থেকে বের হওয়া জল তাঁর বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। অবাক হলেন রামনিধি। তাঁর নিজের বুকের ভিতরে জমে থাকা কান্না কী করে শ্রীমতীর চোখ থেকে বের হয়ে আসছে! কোনও আধিভৌতিক ব্যাপার-স্যাপার নেই তো! এই ঘরে ঢোকার সময় তাঁর শরীরটা কেমন সিরসির করছিল! জ্বরটরও আসতে পারে! মেয়ের শরীর দাহ করে এসে আবার গঙ্গায় স্নান করতে হয়েছে অপরাহ্ণে। নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে। সাধারণত রোগ-ব্যাধি নেই রামনিধির। যদি জ্বর এসেও যায়, ভাবনা নেই, বাড়িতে সালসাবটিকা আছে, একদম মোক্ষম দাওয়াই। কিন্তু শ্রীমতী এতটা কাঁদছে কেন! তাঁর মেয়ের মৃত্যুতে শ্রীমতী এতটা আর্ত হয়েছে! রামনিধির বেদনা শ্রীমতী এমনভাবে ভাগ করে নিয়েছে! এই রূপসীর বুকের ভার নিজের বুকের উপর নিয়ে রামনিধির নিজেকে ধন্য লাগে।

নিত্যানন্দ বৈরাগী মুখ ভার করে বসে আছে। সবাই খাওয়াদাওয়া করছে রাজবাড়িতে, কিন্তু তার খাওয়া-দাওয়ায় মন নেই। আজও মল্লিকবাড়ির প্রতিযোগিতার মতো তার জোড়াসাঁকো দল একটুর জন্য হেরেছে। বড় মুখ করে সে বলেছিল, এদিন জোড়াসাঁকোর জয় হবেই। জোড়াসাঁকো দলের কেউ নন, কিন্তু গান দিয়েছিলেন, সেই রাম বসুও

হতাশ। মাথা নিচু করে লুচি আর মিষ্টি খেতে খেতে মাথা তুলে মাঝে মধ্যেই কড়া চোখে চাইছে। নিত্যানন্দ বুঝতে পারে, হয়ে গেল। আর এ দলে তার ঠাঁই হবে না। সে তো নিজের পয়সায় বাগবাজারের বেহালাবাদক রসিকচাঁদকে নিয়ে সোনাগাজীর মাগবাড়িতে মদ্যপান ইত্যাদি করিয়েছে। কথা ছিল সখীসংবাদের সময় সে বাজনায় ভুল করলেই মোহনচাঁদ কেটে যাবে। আর নিধুবাবুর দলের মূল শক্তি ওই মোহনচাঁদ। তার তাল কেটে গেলে কেল্লা ফতে।
কিন্তু কোথায় কী! দু'দল একই সারদা গেয়েছে। কিন্তু সখী সংবাদের সময় মোহনচাঁদ তার সোনা দিয়ে বাঁধানো গলায় চিতেন, পর চিতেন, ফুকা, ডাবল ফুকা , মেলতা, মহড়া— গাহনা একেবারে স্বর্গের উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। রসিকচাঁদের হাতের বিসদৃশ সাজবাজনা কেউ মনে রাখেনি। শ্রোতাদের হাততালিতে মাথা ঠিক রাখা দায় হয়েছে।
বিচারক হরু ঠাকুর অবশ্য জোড়াসাঁকোর দলের খুব প্রশংসা দিলেন। নিত্যানন্দদাস বৈরাগীর দিকে চেয়ে বললেন, "নিতে বোষ্টম, তুমি একেবারে মাত করে দিয়েছ হে! ঢোলে তোমার খাসা একখানা হাত হয়েছে। আমার দলে যখন বাজাতে তখন এত মিষ্টি হয়নি। তোমার আড়ি আর তেহাই তো বুকের মাঝে গেঁথে আছে হে।"
নিতাই খুশিতে রাম বসুর দিকে চাইল একবার। মনে মনে বলেছে, বলছিলাম না, এ যাত্রা আমাদের কেউ থামাতে পারবে না। আমরাই জয়ী হব! কিন্তু একটু থেমে হরু ঠাকুর আবার বলতে লেগেছেন, "তবে নিতাই, তুমি ভাল বাজনদার হলেও, ভাল বাঁধনদার হয়ে ওঠনি এখনও। তোমার জোড়াসাঁকোয় অন্যেরা বেশ গেয়েছে। কিন্তু নিধুর গানের বাঁধন আর মোহনচাঁদের কণ্ঠের মধুচন্দ্রিমা এমন মাখোমাখো, পিরিতি হইহই করে উঠেছে হে। আহা!"
জোড়াসাঁকোর সিংহবাবু পইপই করে বলেছিলেন নিতে বোষ্টমকে না নিতে। ভবানী বণিকের দলে গান দিতে দিতে হরু ঠাকুরের দলের এই নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর সঙ্গে আলাপ হয় রাম বসুর। হরু ঠাকুর দল ভেঙে দিলে আতান্তরে পড়ে নিতাই। তখন রাম বসুর শরণাপন্ন হলে, তার সুপারিশে জোড়াসাঁকোর দলে ঠাঁই হয় নিতাইয়ের। তার মুখ তো শুধু এখানে পুড়ল না! সিংহবাবুও তো এবার বাঁকা চোখে তাকাবেন! মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে রাম বসুর। শেষে হরু ঠাকুর বিজয়ীর মালা যখন নিজের হাতে রামনিধির গলায় পরিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি রাম বসু। চোখের উপর দেখছে রায়বাহাদুর রাজকৃষ্ণ দেব নিজের হাতে বিজয়ী দলের অধিকারী রামনিধির হাতে পাঁচহাজার এক টাকা শুধু নয়, দলের পনেরোজনকেই একজোড়া করে শাল উপহার দিলেন। আর আদেশ দিলেন পনেরোটা কচি পাঁঠা দপ্তরিখানা থেকে প্রত্যেকের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে, যাতে গাহনার দলের বাড়ির লোকেরাও খাওয়াদাওয়া করে রাজকৃষ্ণ দেবের গুণগান করে।
রাম বসু প্রায় বাপের বয়সি লোকটিকে সভার মাঝেই চেঁচিয়ে বলল, "আর কতদিন হে বুড়ো ভাম! গাহনার নতুন রীত তো কিছুই জানেন না। তাও মধ্যস্থতা করতে আসেন! এই আখড়াই জগতে আর কেউই যেন গাইতে জানে না! আপনার চোখে নিধু ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। আপনি যেখানেই মধ্যস্থতা করেছেন, নিধুর দল ছাড়া অন্য কাউকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন কোনওদিন!"
রাজকৃষ্ণ হস্তক্ষেপ করলেন। হরু ঠাকুরেরও যথেষ্ট ভক্ত আছে এখানে। গোঁড়ায় গোঁড়ায় যেন লাঠালাঠি শুরু না হয়ে যায়! চন্দননগর অঞ্চলে তো একবার নিত্যানন্দের অনুরাগীরা অন্য দলের ভক্তদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল! তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘোষণা করলেন, "আমি জোড়াসাঁকোর গাওনা পুরোটা শুনেছি। খুবই ভাল গাওনা হয়েছে। আমি খুশি হয়ে ওই দলের সবাইকে জোড়া শাল উপহার দেব। আপনারা আহার করে নিন। বাড়ি যাওয়ার আগেই প্রত্যেকে শাল পাবেন।"



কথা ছিল সখীসংবাদের সময় সে বাজনায় ভুল করলেই মোহনচাঁদ কেটে যাবে। আর নিধুবাবুর দলের মূল শক্তি ওই মোহনচাঁদ। তার তাল কেটে গেলে কেল্লা ফতে। কিন্তু কোথায় কী!

দাসী আলতাবালা ঠাকরুণের সঙ্গে পালকি চেপে গঙ্গায় চান করতে যেতে পেরে খুব খুশি। একটা খুশি, ঠাকরুণের সঙ্গে পালকিতে চাপা। আর একটা, গঙ্গা চান। শ্রীমতীর আজ খুশি খুশি লাগছে। আজ বেশ খানিক আগেই ঘুম থেকে উঠেছে। আগে থেকে বলা ছিল বলে বেহারারা চলেও এসেছিল। আলতাবালাকে নিয়ে গঙ্গায় চান করতে গিয়েছিল খুব ভোরে। ভোরের নিজস্ব একটা মাহাত্ম্য আছে। মন ভাল করে দেয়। উড়ে বেহারারা বলেছিল পালকিসুদ্ধু জলে চুবিয়ে দেবে। কলকাতার বড় বড় বাড়িতে মেয়েদের গঙ্গাস্নানের এরকমই রেওয়াজ। কিন্তু আলতাবালা বেঁকে বসে। তার ভয়, যদি পালকিসুদ্ধু জলে ছেড়ে দেয় ওই ষণ্ডামার্কা লোকদুটি! তখন কী হবে! আর বের হতে পারবে না। তখন ডুবে মরা। ডুবে মরা মানে অপঘাতে মরা। তখন ভূত-প্রেত হয়ে কাল কাটাতে হবে। শ্রীমতীও দেখল ঘাটে এই সকালে লোকজন নেই। পালকি থেকে নেমে চান করলে তেমন দোষের হবে না। কেউই দেখতে পাবে না। আর মহানন্দের নিজের হাতে কেনা এই পালকি জলে ডুবিয়ে সে নষ্ট করতে পারবে না। এই পালকিতে ওঠার পর বেহারারা যখন দুলকিচালে পথ চলে, তখন মনে হয় রাজা মহানন্দ যেমন শয্যায় শ্রীমতীকে দুলকি চালে নাড়াতেন, ঠিক তেমন। শ্রীমতীর মুখ ভাললাগায় আরও খানিক লাল হয়ে যায়। যেমন আজ হচ্ছে। দুই বেহারা গঙ্গা থেকে ফেরার পথে গানও ধরেছে। আলতাবালার শরীর বেশ ভারী। শ্রীমতীর মতো ফুরফুরে নয়। ওরা গান ধরেছে, "উঃ কী ভারী মাল রে বাবা/ নাঃ! এটা একটা হাতি।/ উঃ! এর কী ভীষণ ওজন/ এসো এটাকে আমরা নাবিয়ে দি।/ তাই জলদি করে চলা যাক/ লাফিয়ে চলো চটপট।"
শ্রীমতীর মনে কী যেন অন্য হাওয়া লেগেছে আজ। গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে আলতাবালা যেমন মহা খুশি, তেমনি শ্রীমতীরও কেমন একটা অন্য লাগছে। অন্য কোনও দিন যেন আজ। কিন্তু কী দিন!
সন্ধ্যাবেলায় দরজায় ঠকঠক শব্দ উঠেছে। আলতাবালা এসে বলল, "মা ঠাকরুণ, নীচে একটা বাচ্চামতো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"
ধকধক করে উঠল শ্রীমতীর বুক। তাহলে এইজন্য সকাল থেকে মনটা অন্য রকম হয়ে উঠেছিল। চার-পাঁচ মাস কি তার অনেক বেশি হবে। বাচ্চা ছেলে শুনেই বুঝেছে

শ্রীমতী, এ মোহনচাঁদ না হয়ে যায় না। কিন্তু এত সময় নিল সে এ বাড়িতে আসতে! শ্রীমতী ভেবেছিল সেই নিদাঘের দিনেই হয়তো এসে পড়বে। কিন্তু গ্রীষ্মের পর বর্ষা গেছে, শরৎ গেছে, হেমন্তেরও শেষ। গায়ে পাতলা আরও একখান কাপড় ভাঁজ করে লাগাতে হয় এখন। শ্রীমতী নিজেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল উত্তেজনায়।

"এসো এসো। আরে ও আলতাবালা, কে এসেছে দেখ না মাগি! এ আমাদের বাগবাজারের সেরা গাইয়ে। একেবারে কিন্নরপুরুষ। এ আমাদের মোহনচাঁদ। না না, তুই পাকের ঘরে যা রে আলতাবালা। ভাল খাবারদাবারের আয়োজন কর।"

শ্রীমতী মোহনচাঁদকে দেখে একদম আদেখলাপনা করছে। দাসী ভিতর-ঘরে গিয়ে মাসিকে বলেছেও সে কথা। মাসি পা ছড়িয়ে মুখে পান গুঁজতে ব্যস্ত ছিল। এই সন্ধেবেলায় তার একটু আরাম করার সময়। সে এই সময় একগ্লাস দুধ আর একটু আফিং খায়। তারপর মুখে পান গুঁজে ঝিমোতে থাকে। ওই ঝিমোনোতেই তার যত আমোদ। সে পিক ফেলার ডাবরের ভিতর মুখের ভার লাঘব করে গজগজ করে, "যে খুশি আসুক, যখন খুশি আসুক, আমাকে না ডাকলেই হল। এখন যেন তার না আবার গানের মজলিস বসানোর ইচ্ছে জাগে! আমি বাপু রাত জাগতে পারবনিকো। তুই আলতাবালা, এক কাজ কর, খুব ভাল ভাল খাবার খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দে তো।"

"কী বলো গো মাসি! এ যে এক্কেবারে বাচ্চা ছেলে। দেখে তো মনে হয় দুধ খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে উঠতে পারেনি। একে কী করে মাংস, লুচি আর মদ বেড়ে দেব! তামুক বানিয়ে দিতেই তো ইচ্ছে করছে না। এ তো ঠাকরুণের হাঁটুর বয়সি হবে।"

"তোরও বলিহারি মাগি, এই সব গানবাজনার লাইনে বয়স নিয়ে কেউ ভাবে না। যার যেথা মজে মন, কি বা হাড়ি কি বা ডোম। তুই যা রে আলতাবালা, আমারে জ্বালাস না তো! তোর কাজ তুই করগে যা। আমারে না ডাকলিই হল।"

শ্রীমতী বৈঠকখানা ঘরে একটা কৌচের উপর বসতে দিল মোহনচাঁদকে। সেদিন ভিড়ের ভিতর ভাল করে দেখতে পায়নি। রাজা মহানন্দ রায়, নিধুবাবু, মাসি, সারেঙ্গিবাদক, বাইরে থেকে আসা বাজনদাররা ছিলেন। অনেক যত্ন দিয়ে নিজের কৌতূহল চেপে রাখতে হয়েছিল। আজ সে মোহনচাঁদকে কৌচের উপর বসিয়ে নিজে একটু দূরে একটা টুল এনে তার উপর বসল। সেদিন সে ইচ্ছে করে এমন একটা বিপদ বাধিয়ে ফেলেছিল। মনে পড়তেই অনুশোচনা হচ্ছে। যদি মাথা বা কপাল ফেটে যেত! এই সুন্দর কপালে দাগ হয়ে যেত!

মোহনচাঁদ মাথা নামিয়ে বসে আছে। তার দীর্ঘ শরীর। চাঁদের মতো ঝকঝকে ললাট। নাকের নীচে সবেমাত্র গোঁফের রেখা ধরেছে। চওড়া কাঁধ। কাঁধের উপর থেকে বাবুদের মতো ভাঁজ করা চাদর ঝুলছে। তার ঘিয়ে রঙের মখমলের আংগরাখা। ঝলমল করে আছে। আর শহরের প্রধান প্রধান কবিয়ালদের মতো চুল লম্বা হয়ে ঘাড়ের কাছে এসে বাঁক নিয়ে আবার উপরে উঠেছে। ঠোঁট বেশ গোলাপি। সাধারণত খুব ফরসা মেয়েদের অমন হয়।

শ্রীমতী বুঝতে পেরেছে তাকেই এর আড় ভাঙার দায়িত্ব নিতে হবে। রামনিধির সঙ্গে আলাপের সময় তাকেই এগিয়ে যেতে হয়েছিল। শিল্পী মানুষেরা একটু নরম সরম থাকে। তাদের লোক-লজ্জা থাকে। জমিদার, বড়লোকদের মতো প্যাঁচ-ঘোঁচ জানা ডাকাবুকো হয় না।

কিন্তু শ্রীমতীকে চমকে দিয়ে মোহনচাঁদ মাথা তুলে মিষ্টি করে বলল, "আপনার গান শুনতে চলে এলাম।"

শ্রীমতী চমক প্রকাশ না করে মনের কথা মুখে বলেই ফেলল, "তা চাঁদবাবুর এত মাস বাদে ওই গানের কথা মনে পড়ল!"

মোহনচাঁদ একেবারে চোখে চোখ রেখেছে। দু'জনের চোখই সুন্দর, সতেজ। শ্রীমতীর চোখে যদি দেবীভাবের প্রকাশ থাকে তবে মোহনচাঁদের চোখও কম যায় না। তার চোখেও জাদু পোরা আছে। লোকে তো তাই বলে। মোহনচাঁদ জানে তা। সে সময়বিশেষে তার চোখ-অস্ত্র কাজে লাগায়।

মোহনচাঁদের বয়স বেশি না হলেও গানের আসর করে করে শিখে গেছে যে চোখে চোখ রেখে কথা বললে অন্যের উপর কী প্রভাব আছে বা না আছে, নিজের বুকে বেশি বেশি করে সাহস ঢুকে আসে।

মোহনচাঁদ সাবলীলভাবে বলল, "দেখুন, ইচ্ছে আমার অনেক দিন থেকেই রয়েছে। কিন্তু আখড়াই গানের দলে ঢুকে তো আমার সব স্বাধীনতা চলে গেছে। এতদিন শুধু মহড়া দিয়ে চলেছি। আসার মতো সময় পাইনি। গতকাল সেই আখড়াই দলের একটা বড় গাওনা আমরা জয় করে ফেলেছি বলে আজ ছুটি পেয়েছি। আজ আর মহড়া নেই। তাই চলে এলাম।"

"তা কোন দলে গাওনা গাওয়া হচ্ছে চাঁদবাবু?" শ্রীমতীর চোখ নাচে। ঠোঁটে খেলা করছে মিষ্টি হাসি।

"সে তো আপনি জানেন। আমার গুরুর দল। ওই বাগবাজার আখড়াই দল।"

"তা চাঁদবাবু, আপনার গুরুটি কে?" শ্রীমতী দিব্য জানে সব। তবুও কথা চালানোর জন্য প্রশ্ন করে।

"আজ্ঞে, আচার্য রামনিধি গুপ্ত।"

শ্রীমতী মোহনচাঁদের কাছে সহজ হতে চায়। সে বলে, "তা রামনিধিবাবুরও তো দেখা নেই অনেকদিন।"

"উনি সময় পাবেন কোথায়! দলের অধিকারী। কত দিকে মাথা দিতে হয়। এই তো আজ রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে গাওনা শেষ করতে করতে সকাল হয়ে গেছিল। সেখানে পঙক্তিভোজন করে, বাড়ি ফিরতে ফিরতে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। বাড়িতে পুরস্কারের টাকা, শাল-টাল রেখে বসে আছি। কিন্তু ঘরে বসে থাকা তো স্বভাবে নেই। গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে করতে আপনার কথা মনে এল। ভাবলাম যাই। ফুরসত যখন পেয়েছি একবার ঘুরেই আসি। আর উপরি পাওনার মতো যদি আপনার গান শুনে মন ভাল করা যায়!"

"আমার গান তো আপনার ভাল নাও লাগতে পারে!"

"তা কেন হবে! আমার গুরুদেব তো আপনার গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

আলতাবালা খুশি হয়েছে। তখন মাসির মুখ শুনে মোটেও তার ভাল লাগেনি। এ বাড়িতে সে যা কাজ করে, তার কণামাত্রও করে না এই মাসি। শুধু খাও-দাও পান বানাও আর আয়েস করো।

সে মনে মনে জ্বলে। সকালবেলায় রাধাগোবিন্দ জিউ-এর সেবা চড়ানো ছাড়া আর কী বা করতে হয় মাসিকে! কুটোটি নাড়ে না। এ বাড়ির সবই তো একা হাতে এই আলতাবালাকে সামলাতে হয়।

শ্রীমতী জলসাঘরের আলো জ্বেলে দিতে বলায় খুশি হয়েছে সে। মাসির আফিং-এর ঘুমের দফা রফা হল। আর কিছুই বলতে হয় না শ্রীমতীর। আলতাবালা আলো জ্বেলে মাসিকে ডাকবে। তারপর নীচে যাবে সারেঙ্গি আর তবলাবাদককে বলতে। এর মাঝে মাসিকে সাজগোজ করে হারমোনিয়মে বসতে হবে।

শ্রীমতী বলল, "দাসী, আজ আর নীচের লোকজনকে ডাকতে যাস না। আজ মাসিই সারেঙ্গিতে বসবেখন। হারমোনিয়মের বড্ড চড়া আওয়াজ। আমার কষ্ট হয় পাল্লা দিতে। আজ হারমোনিয়ম দরকার নেই।"

(ক্রমশ)

অলংকরণ: সৌমেন দাস



ছবি: ইনস্টাগ্রাম

পুজোর আগে বাংলায় গান রেকর্ড করলেন অলকা ইয়াগনিক। কলকাতা নিয়ে বরাবরই স্মৃতিমেদুর কিংবদন্তি এই শিল্পী। দুর্গাপুজো থেকে কলকাতা, সব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আড্ডায় মধুরিমা সিংহ রায়।

"মুম্বইতে থাকলেও মন পড়ে থাকে কলকাতায়"

কলকাতার মানুষদের মনে আপনার জন্য বিশেষ জায়গা আছে। আপনার মনেও...
কলকাতা আমার কাছে বরাবর স্পেশ্যাল। আমি তো বলি, আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার মন সবসময় কলকাতায় পড়ে থাকে! মুম্বইতে থাকলেও, হৃদয়টা কলকাতাতেই থাকে।

পুজোর ঠিক আগে বাংলা গান রেকর্ড করলেন। অভিজ্ঞতার কথা একটু বলুন...
'ফিরে পাওয়া' আধুনিক রোম্যান্টিক গান। আবার খুব ক্যাচি টিউন। লোকে একবার শুনলেই গুনগুন করতে শুরু করবেন। শিলাদিত্য-রাজের কম্পোজ়িশন। সোহমের লেখা। আশা অডিও থেকে রিলিজ় হচ্ছে গানটি। অপেক্ষা (মিউজ়িক লেবেলের কর্ণধার) আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল আগেই। ওই অনুরোধ করে দুর্গাপুজোর জন্য একটা গান গাইবার। দীর্ঘদিন পরে গাইলাম পুজোর গান। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভাল, তাই প্রস্তাবে রাজিও হয়ে যাই। আর উপলক্ষ তো দুর্গাপুজো...আমি জানি কলকাতার মানুষের কাছে এই উৎসবের কী গুরুত্ব! দুর্গাপুজোর আগে বাংলায় অনেক গান রেকর্ড হয়।

দুর্গাপুজোর কোনও বিশেষ স্মৃতি রয়েছে?
ছোটবেলার কিছু সময় কলকাতাতেই কেটেছে। তাই, দুর্গাপুজো, প্যান্ডেল, মানুষের প্রবল উৎসাহ...এগুলোর সঙ্গেই বড় হয়েছি। প্রত্যেকদিনই প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে গানের অনুষ্ঠান, নাটক হত পুজোর সময়ে। নিউ আলিপুরে থাকতাম। বাড়ির কাছেই পার্কে বড় করে পুজো হত। প্রতিদিন ওখানে যেতাম। সকালে ভোগ খেতাম, আর সন্ধেতে ফাংশন হত। কোনও না কোনও অনুষ্ঠান

হতই! আমি আর আমার ভাই প্রায় সারাদিনই ওই প্যান্ডেলে কাটিয়ে দিতাম। এসবকিছুই আমার স্মৃতিতে বড্ড উজ্জ্বল। এই একটা সময়ে আমি কলকাতাকে সত্যিই মিস করি ভীষণ।

বাঙালিরা পুজোর আগে নতুন পোশাক কেনেনই। আপনারও কি সেরকম কোনও রিচুয়াল আছে?

হ্যাঁ, একদম। পুজোর আগে নতুন পোশাক কিনি। স্টাফেদের নতুন পোশাক দিই। এই ঐতিহ্য কলকাতা থেকেই শেখা আমার। ওই যে বললাম মুম্বইতে থাকি বটে, কিন্তু মন কলকাতায় (হাসি)।

স্টেজ শোয়ের জন্য বহুবার কলকাতায় এসেছেন। এখানকার বর্তমান শ্রোতাদের নিয়ে কী বলবেন?

আমার মনে হয়, ক্যালকাটা হ্যাজ় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অডিয়েন্স এভার। তা সে আগেই হোক, আর এখন। মিউজ়িক সেন্স প্রবল ওখানে। কলকাতার মাটিতেই সুর আছে। কলকাতাই বোধহয় একমাত্র জায়গা যেখানে লোকে শীতকালে খোলা আকাশের নীচে সারারাত বসে গান শোনেন! আমি এরকম একাধিক অনুষ্ঠান করেছি, দেখেছি মানুষ মাথা থেকে পা অবধি ঠান্ডায় কাঁপছেন, তবু গান শোনা থামাননি। মাটিতে বসে শুনছেন, কিন্তু কোনও অভিযোগ করছেন না কেউ। এতটাই প্যাশনেট শ্রোতা।

গান গাইতে গাইতে ৪০ বছর পেরিয়ে গেল...কী মনে হয়?

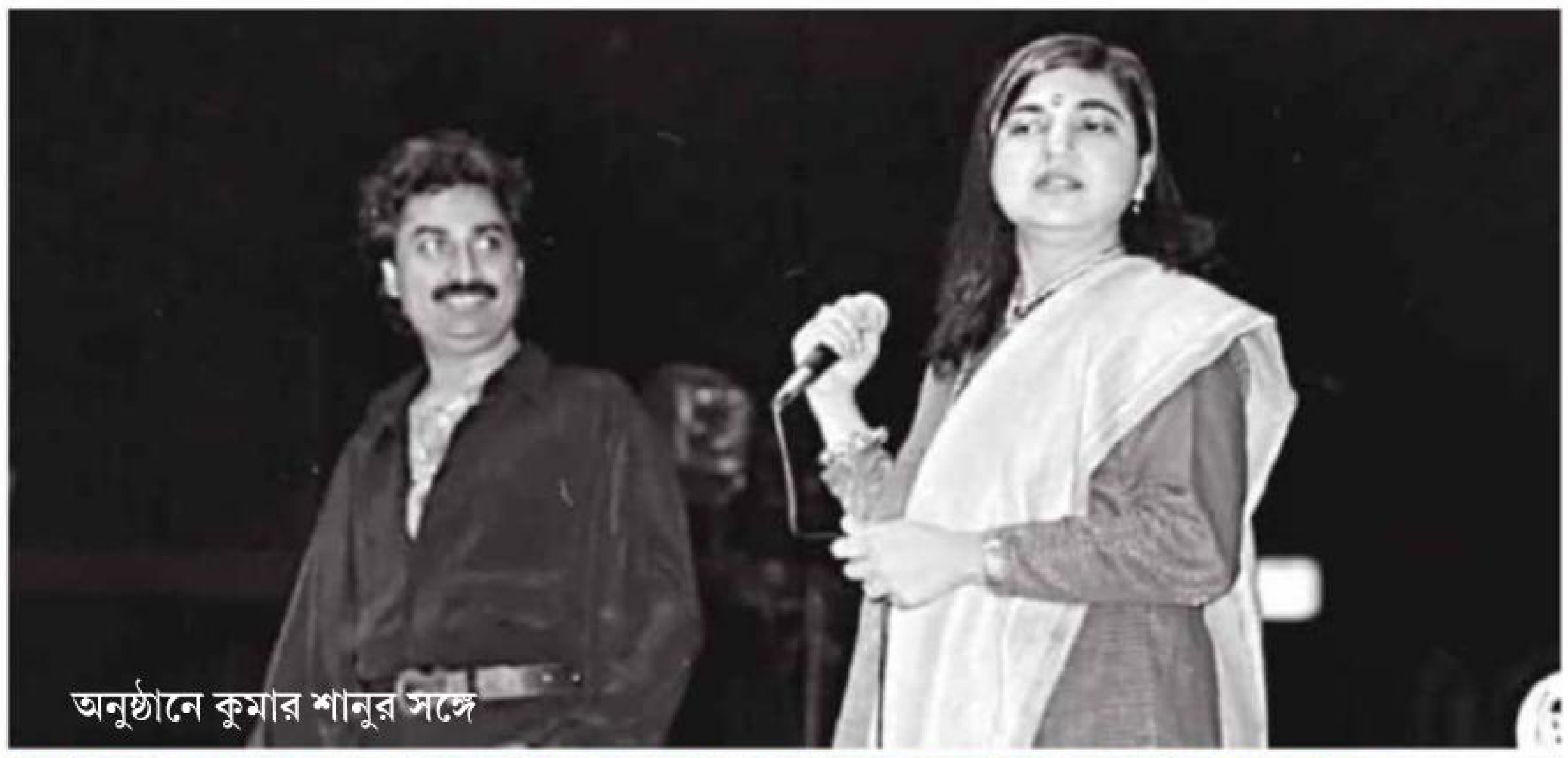
সবকিছু এক নিমেষে হয়ে গেল যেন! অনেকগুলো বছর মাঝখান থেকে কেটে গেল গান গাইতে গাইতে। হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করলাম, প্রায় ৪০টা বছর কেটে গেল! খুব কম বয়সে শুরু করেছিলাম। দ্যাট ওয়াজ় মাই অ্যাডভান্টেজ। মিড-টিনএজ থেকেই সিনেমাতে গাইতে শুরু করি। স্কুল ছুটি থাকত যখন মুম্বইতে এসে গান রেকর্ড করতাম। তারপর আবার কলকাতায় ফিরে যেতাম। আমার বাবা-মা আমাকে 'পুশ' করতেন। নাহলে, আমি বড্ড কুঁড়ে ছিলাম। ওঁরা জোর না করলে বোধহয় কিছুই হত না। বিশেষ করে, আমার মায়ের কথা বলব।

মিউজ়িক ইন্ডাস্ট্রিকেও তো অনেকটা বদলাতে দেখেছেন...

এখন টেকনিক্যালি অনেক উন্নতি হয়েছে ঠিকই, তবে গানের 'প্রাণ' কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাংলা গানে এখনও সেই 'সোল' খুঁজে পাই। গানের মিষ্টত্ব, মেলডিই বাংলা গানের ইউএসপি। হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ় বিকাম ভেরি পলিউটেড।



কলকাতায় পারফর্ম করছেন



অনুষ্ঠানে কুমার শানুর সঙ্গে



গানের রেকর্ডিংয়ে

> বরাবরই কাজের জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরেছি। ওয়র্ক ট্রিপ হলে আপনার মনোযোগটা কাজের উপরেই থাকবে। এখন খোলামনে ট্র্যাভেল করতে চাই। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, মানুষদের আরও বেশি করে আবিষ্কার করতে চাই। আই ওয়ান্ট টু স্প্রেড মাই উইংগস অ্যান্ড সি দ্য ওয়র্ল্ড।

তাহলে বাংলাতে আরও বেশি করে শুনতে পাব আপনাকে?

হ্যাঁ, কেন নয়? আমি বরাবরই বাংলায় গান গাইতে আগ্রহী।

এরপর নতুন কী কী গান আসছে?

সত্যি বলতে কী, আমি এখন কাজের পরিমাণ অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি। এতদিন ধরে যা-যা করার সময় পেতাম না, এখন সেগুলোই করতে চাই। গান গাইছি অবশ্যই, তার বাইরে প্রচুর ট্র্যাভেলও করছি। এখন তো রীতিমতো টেনশন হয়, জীবনে কখন কী হয় কোনও ভরসা নেই! তাই, এখন আর আগে থেকে বিশেষ কোনও পরিকল্পনা করি না। কোনও গান এলে, যদি মনে হয় আগে এরকম কিছু গাইনি বা আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং, তাহলে আমি করব। রান অফ দ্য মিল ধরনের কাজ এখন আর করব না।

অবসর জুড়ে তাহলে কি শুধুই বেড়ানো?

বেড়াতে খুব ভালবাসি। কিন্তু কোনওদিনই পারিনি। বরাবরই কাজের জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরেছি। সারা বিশ্ব ঘুরে ফেলেছি প্রায়, কিন্তু সবই কাজের সূত্রে (হাসি)। আর ওয়র্ক ট্রিপ হলে আপনার মনোযোগটা কাজের উপরেই থাকবে। গান গাইতে হলে টায়ার্ড হলে চলবে না, পারফর্ম করার আগে গলার যত্ন নিতে হবে ইত্যাদি। তাই পুরো উপভোগ করতে পারিনি কোনও জায়গাতেই। এখন খোলামনে ট্র্যাভেল করতে চাই। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, মানুষদের আরও বেশি করে আবিষ্কার করতে চাই। আই ওয়ান্ট টু স্প্রেড মাই উইংগস অ্যান্ড সি দ্য ওয়র্ল্ড। এখন একটি সর্বভারতীয় চ্যানেলের রিয়েলিটি শোয়ের বিচারক আমি। তাই, বিশেষ কোথাও যেতে পারছি না। শোয়ের গ্র্যান্ড ফিনালে হয়ে গেলে একটা ব্রেক নিয়ে ঘুরতে চলে যাব। তবে গান থাকবে আমার সঙ্গে, শেষ নিঃশ্বাস অবধি।



মেটারনিটি লিভ

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

বাচ্চার জন্মের পর সেদিনই বিশাখাদি প্রথম অফিসে এল। আর এসেই এই বিপত্তি। আমাদের টিম লিডার প্রদীপ্তদাকে বললাম, ''একটা জরুরি জিনিস কিনতে হবে। একটু বেরোব। যাব?''
প্রদীপ্তদা বলল, ''ঘুরে আয়। বেশি সময় নিবি না।''
প্রদীপ্তদা ভাবল, আমি বোধ হয় স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে যাচ্ছি। না হলে কখনও এই সময়ে কেউ অফিসের বাইরে যেতে চায়? কিন্তু তা নয়। স্যানিটারি ন্যাপকিন আমরা সবসময়ে নিজেদের লকারে রাখি।
বিশাখাদিকে দেখলাম, দোপাট্টা নিয়েছে। মা হওয়ার পর নাকি মেয়েদের বুকের শেপ নষ্ট হয়ে যায়। মনটা একটু খচ করে উঠল। গুনগুনের জন্ম তো বিশাখাদিকে খুশিই করেছে! সেরকমই দেখেছি। দোপাট্টা নেওয়ার কারণ যা-ই হোক, সেটা খুব কাজে দিয়েছে।
বিশাখাদি মোবাইলে মেসেজ পাঠাল, 'রোদসী, শিগগির আমার ডেস্কে আয়।'
যেতেই বিশাখাদি বলল, ''ব্রেস্ট মিল্ক বেরিয়ে কামিজ় বিচ্ছিরিভাবে ভিজে গেছে। তুই শিগগির একটা ব্রা আর কামিজ় কিনে নিয়ে আয়।''
বুঝলাম, বুকের শেপ নিয়ে বিশাখাদির আদৌ মাথা ব্যথা

নেই। আমি আর এত সব জানব কী করে? বিশাখাদির কাছেই জানলাম, গুনগুন এই ক'মাস মা'র ব্রেস্ট মিল্কই খেয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। মা'র বুকে যত দিন দুধ হবে, তত দিনই বাচ্চাকে সেই দুধ খাওয়াতে পারলে ভাল। ডাক্তাররা তা-ই বলেন।

বয়সে বড় হলেও আমরা খুব ভাল বন্ধু। বিশাখাদির সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে। মতেরও মিল। আমাদের দু'জনের চুল পিক্সি কাট। আমাদের দু'জনেরই নাকে ফুটো— রিং পরা। ছোট চুল বা জিন্সের সঙ্গে নাকছাবি বা নোলক ধরনের নাকের গয়না ম্যাচ করে কি না, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমার পছন্দ, আমি পরব। বুকের শেপ নিয়ে বিশাখাদি ভাববে, বাচ্চা ব্রেস্ট মিল্ক টানলে বুক নষ্ট হয়ে যাবে— এমন ভাবনা বিশাখাদির মাথায় আসবে, সেটা আমি কী করে চিন্তা করলাম! নিজেকে অপরাধী মনে হল।

জিনিসটা বিশাখাদিকে দিয়ে, সে সব কথাই ভাবতে ভাবতে ছাদের কাফেতে এলাম। কফি নিলাম। ছাদের কাফেতে আসতে গেলে আমাদের ভিআইপি করিডরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। ভিআইপি করিডর নামটা অবশ্য আমার দেওয়া। কারণ এই করিডর লাগোয়া চেম্বারগুলোয় কোম্পানির হোমরাচোমরারা বসেন। আমাদের এমডি মিহির বসুর চেম্বারও এখানে।

এক কাপ কাপুচিনো নিয়ে ছাদের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালাম। আকাশটা দেখেই মন ভাল হয় গেল। পুজো আসতে আর কয়েক সপ্তাহ বাকি। আকাশে ছড়িয়ে গেছে পুজো পুজো রং। বাতাসে পুজো-পুজো গন্ধ। এই সময়টা অকারণ পুলক জাগার সময়। আমাদের এমডি মিহির বোসেরও কি এমন অকারণ আনন্দ হয়? তিনিও কি তাঁর বিশাল গ্লাস ডোর দিয়ে মাঝে মাঝে বাইরেটা দেখেন? দেখেন, কী করে বদলে যায় আকাশ-বাতাস? সেদিন সকালের রোদ কবোষ্ণ ওম নিয়ে তাঁর ঘরে মায়ার খেলা শুরু করেছিল। এমডি নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিলেন মায়াবী সকালটাকে।

তাঁর কর্মীরা ধীর, সংযত। তাঁরা মায়ার খেলায় বাঁধা পড়েন না। নিয়ম নেই। তিনি 'সেই ট্র্যাডিশন'-এর ভক্ত প্রহরী। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা— তিনি কোনও না-কোনও শেডের নীল বা কালো সুট পরেন। কোটের ভাঁজ অটুট রাখতে সেটিকে পরম যত্নে কোট স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে রাখেন। তাঁর জুতো কালো চকচকে, সদ্য পালিশ-স্নাত। জীবনযাত্রার ব্যাকরণে তাঁর অটুট আস্থা। তাঁর মতো আমাদেরও অফিস-জীবন চলে ঘড়ির কাঁটায়, নিয়মের পিঠে চড়ে। তবে, এমডি না-পরলেও, অফিসে ক্যাজুয়াল পরার নিয়ম আছে। টি-শার্ট পরলে কলারওয়ালা পরতে হয়। জিনস পরলে আমি শার্ট বা কুর্তি পরি। পোশাকে ছাপছোপ, আঁকিবুকি, বিবিধ রঙের খেলা চলে না।

এমডি-র চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। পুরনো স্টাইলের। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। চোখ নামিয়ে নিতে হয়। অফিসের বসেরা তাঁকে ভয় পান। তিনি অল্প কথায় কাজ সারেন। তাঁর কথাই নির্দেশ। তিনি নিয়মের বাইরে কিছু করেন না জেনেও, বিশাখাদি ছ'মাস মেটারনিটি লিভ নেওয়ার পর, তা বাড়াতে চেয়েছিল। বিশাখাদির পেট বিরাট বড় হয়ে গিয়েছিল। হাঁটাচলায় দারুণ অস্বস্তি। ডাক্তার ডেট-এর মাস দুয়েক আগে থেকেই ছুটি নিতে বলেন। বিশাখাদি চেয়েছিল, বাচ্চা হওয়ার পর তাকে একটু বড় করে তারপর অফিসে যোগ দেবে। কিন্তু গুনগুন হওয়ার আগে দু'মাসের ছুটি চলে যাওয়ায়, ওর জন্মের মাসচারেক বাদে অফিসে আসতে হল। বিশাখাদি লিভ উইদাউট পে-র আবেদন করেছিল। কিন্তু বিশাখাদির বদলে যিনি কাজ করছিলেন, কোম্পানি তাঁর কাজে সন্তুষ্ট নয়। তাই বিশাখাদির লিভ উইদাউট পে-র অনুমতি মিলল না।

চার মাসের গুনগুনকে বাড়িতে আয়ার কাছে রেখে বিশাখাদিকে অফিসে এল। তখন ল্যাপটপে তার চোখ পড়ে থাকলেও মন জুড়ে থাকত গুনগুন। বেবি ফুড খাচ্ছে তো? অভ্যেস করানো উচিত ছিল। ভেবেছিল, লিভ উইদাউট পে-র সময়টায় বাচ্চাকে বোতলে খাওয়া, বেবি ফুড খাওয়ার অভ্যেস করাবে। 'উইদাউট পে' যে পাবে না, সেটা ভাবেনি। গুনগুন নিশ্চয়ই বোতল থেকে খাবার টানতে চাইছে না। একটাই স্বস্তি। আয়াদিদিকে ভাল পেয়েছে বিশাখাদি। গুনগুন ভোর সাড়ে চারটেয় খায়। তারপর সাতটায়। সকালে রেডি হয়ে সাড়ে ন'টায় খাইয়ে ক্যাব ধরে অফিস। সেই প্রথম দিনই বিশাখাদি বলেছিল, "আজ দুপুর বারোটার ফিডটা তো দিতে পারিনি। প্রচণ্ড বুক টনটন করছিল। কী যে অস্বস্তি ভাবতে পারবি না। কাজই করতে পারছি না। একটু পরেই ব্রেস্ট মিল্ক উপচে পড়ে এমনভাবে কামিজ় ভিজে গেল যে, ভদ্র পরিবেশে থাকার অনুপযুক্ত।"

"এ রকম তো আবার হবে? কী করবে?"

"মা'কে ফোন করলাম। মা বলল, গুনগুনের খাওয়ার সময়গুলোয় আবার এরকম হবে। বুক টনটন করলে ওয়াশরুমে গিয়ে দুধ বের করে ফেলে দিতে হবে," বলতে বলতে বিশাখাদির চোখে জল চলে এল। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বলল, "আমার বাচ্চার দুধ ফেলে দিতে হবে। আমার দুধের শিশুটুকু তা পাবে না! রোদসী তুই তো মা হোসনি, তুই এই কষ্ট বুঝবি না। আর বাচ্চা যখন দুধ খায়, তার আনন্দও তুই টের পাবি না।'

বিশাখাদি এত কাল শার্ট আর ট্রাউজ়ার্স পরে অফিসে আসত। সিগারেট খেত। ভাল রেস্তরাঁয় লাঞ্চ-ডিনারে গেলে অল্পসল্প ড্রিঙ্কও করত। প্রেগন্যান্সির সময় থেকে সালোয়ার-কামিজ় পরা শুরু করে। ড্রিঙ্কস নিত না। সিগারেটও ছাড়ে। আমাকে বলেছিল, "রোদসী, আমি আর কোনওদিনই সিগারেট খাব না। যে আসছে, তার জন্যে ভাল নয়। একটু বড় হলে, সে-ও খেতে চাইবে। তুইও আর খাস না।"

ভাবছিলাম, এই মেয়েকে দেখলে গড়পড়তা মানুষ কী ভাববে! চোখের দেখা সব নয়। চশমা, দূরবিনের আবিষ্কার বাইরের জিনিস দেখার জন্যে। শরীরের ভিতর দেখার জন্যে এক্স-রে। মন কী দিয়ে দেখবে মানুষ?

২

আজকাল সব অফিসে কর্মীদের কিছু জানানোর থাকলে, তা ই-মেলে জানানো হয়। আমাদের অফিসের ধরনটা আলাদা। এখানে কাউকে আলাদা করে কিছু জানাতে হলে, ই-মেল করা হয়। না হলে সব নোটিস বোর্ডে টাঙানোই রীতি। অফিসের সব তলাতেই একটা করে নোটিস বোর্ড আছে। এখন সব অফিসে ঢোকার জন্যে অ্যাক্সেস কার্ড ব্যবহার করা হয়। আমাদের তা নয়। আমাদের এন্ট্রান্সে টিপ-ছাপ বক্স আছে। সেটায় আঙুল ছোঁয়ালে নাম ফুটে উঠবে। এই নোটিস বোর্ড, অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ডার, এসব দেখলে আমার মনে হয়, এমডি যা চলে আসছে, তা-ই চলুক — এমন ভাবনাতেই স্বচ্ছন্দ।

ওঁর ঘরের বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভিতরে উনি আছেন কী নেই। ঘরের তিনদিকে হালকা স্টেনড গ্লাস লাগানো। ভিতরটা দেখা যায় না। তাঁর ঘরের লাগোয়া টানা ব্যালকনি। ওই ব্যালকনিকে ঝুলন্ত ছাদ বলাই ভাল। সেখানে ফুল ফোটায় মালিরা। এমডি-র ঘর নাকি এত বড় যে, সেখানে চা-কফি হালকা স্ন্যাক্সের জন্যে একটা কিচেনেট আছে। অবাক হয়েছিলাম শুনে যে, ওঁর

বিশাল ঘরে আলাদা পার্টিশন করে খুচরো ঘুমের ব্যবস্থাও আছে। তা ছাড়া, এমডি-র জন্যে এমন চেয়ার রাখা হয়েছে, যেটায় বসে তিনি কাজের সময় কাজ, বিশ্রামের সময় বিশ্রাম নিতে পারেন। কী যেন একটা শুনেছিলাম! 'ন্যাপ টাইম চেয়ার' বা এরকম কিছু একটা হবে! তাঁর অফিসঘরের বর্ণনা শুনে 'ডিএম বাংলো' নাম দিয়েছিলাম। অর্থাৎ 'ডিসিসন মেকিং' বাংলো।
অবশ্য এই নামটা উচ্চারিত হত গোপনে, সন্তর্পণে এবং আমাদের মধ্যে। মানে, আমি ছাড়া এই অফিসের আর চারজন। বিশাখাদি আমাদের টিমে। তা ছাড়া অর্ণা, মোনালি, রুচিকা।
আজও মনে আছে, অফিসে ঢোকার প্রথম দিন, সাদা-কালো ঝাঁ-চকচকে বাড়িটা আমার মনে ভয় আর আনন্দ-মিশ্রিত এক বিচিত্র অনুভূতি তৈরি করেছিল। অন্যদেরও তা হয়েছিল কিনা জানি না। পরে অর্ণা বলেছিল, ''অফিসে ঢুকতে বুক ঢিপঢিপ করছিল।'' অবশ্য মোনালি আর রুচিকা প্রথম অফিস করার উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিল।
অফিস ডেস্কে যতক্ষণ বসে থাকব, ততক্ষণ কোনও কথা চলত না। জরুরি কথা ছাড়া। কাজ ছাড়া যত গুঞ্জনের জন্ম অফিস-ছাদ। কিছুদিনের মধ্যেই ওই ছাদ আমাদের প্রিয় হয়ে উঠল। সকালে এগারোটা-সাড়ে এগারোটা, বিকেলে চারটে-সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা এই কাফেতে আসার চেষ্টা করতাম। আগে থেকে বলাই থাকত। তবে, কাজের চাপে যে সবসময় পাঁচজনই আসতে পারতাম, তা নয়। এটা তো স্কুল নয়, যে নির্দিষ্ট ব্রেক থাকবে। এই কাফে আমার বড় প্রিয় হয়ে উঠল।
ধোঁয়া ওঠা কাপে কফির অ্যারোমা নিতে নিতে, সূর্য ডোবার আগের ধূসর বর্ডার দেওয়া কমলা মেঘ দেখতে আমার বড্ড ভাল লাগে। সেই সময়টা আমার একার। দিগন্তে হেলে পড়া সূর্য দেখতে দেখতে কফির কাপে চুমুক দিই। অন্যমনস্ক হয়ে যাই।
কোনও কোনও দিন সম্বিত ফেরে অর্ণার কথায়। আজকাল এই সময়টায় প্রায়ই মোনালি, রুচিকারা আসে। রুচিকার পছন্দ টি। মোনালির ব্ল্যাক কফি। আমার আর অর্ণার ভোট কাপুচিনোয়। আমাদের দুধ ছাড়া চলে না। বিশাখাদি সত্যিকারের কফিপ্রেমী। কফি কালো হোক বা সাদা, কাপুচিনো বা কাফে লাতে — কোনওটাতেই বিশাখাদির 'না' নেই। আমরা 'নো শুগার টিম'।
প্রদীপ্তদা একদিন বলছিল, ''আমাদের এমডি বিশ্বাসই করেন না যে, মেয়েদের সব কাজ করার দম আছে। মনে করেন, টপ লেভেলে ডিসিশন-মেকিং জায়গায় মেয়েদের নিলে তারা সব তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।''
সেই বহু ব্যবহৃত উদাহরণগুলোই মনে এল। এখন মেয়েরা মহাকাশে, এভারেস্টে... ইন্দ্রা নুয়ি... কোথায় না আর... ঝট করে একটা ছবি চোখের সামনে এল। এখানে যাঁরা প্যারা-স্টাফ, তাঁরা সবাই মহিলা। হ্যাঁ, আমাদের সেই কর্মচারী নেই, যাদের 'বেয়ারা' বলে। সব প্যারা-স্টাফ। কড়কড়ে মাড় দেওয়া সাদা শাড়ি। সরু নীল পাড় বসানো। হুবহু কলকাতার মেয়ে পুলিশ।
সত্যি-মিথ্যে জানি না, এমডি নাকি কথায় কথায় একদিন বোর্ডরুমে বলেছিলেন, ''মেয়েদের নেওয়া অনেক ঝঞ্ঝাট। মেটারনিটি লিভ সেই ঝঞ্ঝাটের মূল কারণ। এখন মেটারনিটি লিভ ছ'মাসের হয়েছে। অনেক মেয়ে আবার এর ওপর লিভ উইদাউট পে চায়। কে অতদিন ধরে তার কাজটা করবে? অল্টারনেটিভ কাউকে নিলে, সে ছুটির পর ফিরে এলে আমরা কি বদলি লোকটিকে তাড়িয়ে দেব?''
বোর্ডরুমে এমডি-র মুখের উপর কে কথা বলবে? এক পারিষদ নাকি বলেন, ''স্যর, উইদাউট পে-তে ছুটি দেওয়া বা না-দেওয়া ম্যানেজমেন্টের ওপর নির্ভর করে।''
কী জানি কেন, এমডি-র কথা সত্যি বলেই ধরে নিয়েছিলাম। খারাপ লেগেছিল। তার শত গুণ খারাপ লেগেছিল, তাঁর পারিষদের বক্তব্য জেনে। তা হলে মেয়েদের বিপদ শুধু রাস্তায় 'খড়্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে' নেই। কত প্রশ্ন ভিড় করে মনে। আমি অর্ণার দিকে তাকাই, মোনালি আমার দিকে, রুচিকা... আমি অস্ফুটে বললাম, ''বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় না এমডি স্যর জেন্ডার-বায়াসড। আমাদের যেভাবে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে... মেয়ে বলে তাতে কোনও ছাড় দেওয়া হয়েছিল নাকি? রেজ়াল্ট থেকে আরম্ভ করে... কোনও কিছু বাকি ছিল না।''
''ছাড় আবার কোথায়? রাউন্ডের পর-রাউন্ড চলেছে।''
''রিট্‌ন, ভার্বাল, ডিসকাশন। কত কী পেরিয়ে ফাইনাল ইন্টারভিউ।''
''আমরা কি ইন্টারভিউয়ের সময় বলেছিলাম, ডিসকাউন্ট কুপন চালু করুন স্যর!''

৩

বিশাখাদি কামিজ় ভিজে যাওয়া রুখতে নতুন ধরনের ব্রা কিনেছে। এক ডজন। তাতে স্পঞ্জ দেওয়া, ব্রেস্ট মিল্ক শুষে নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। হেসে বলল, ''অনেক মেয়ে এ ধরনের ব্রা পরে, বুকের সাইজ় বড় দেখানোর জন্যে!''
'বলব না' 'বলব না' করেও জিজ্ঞেস করলাম, ''ব্রেস্ট মিল্ক ফেলে দিচ্ছ না?''
''কিছুটা ফেলতেই হয়। আমার খুব খারাপ লাগে। স্পঞ্জ ব্রা-র ব্যবস্থাটা তার চেয়ে অনেক স্বস্তিদায়ক।''
বিশাখাদির মুখে মেঘ জমল। আমি একটু চুপ করে থেকে স্বগোতক্তির মতো বললাম, ''আসলে, মেয়েদের জন্য এখন অনেক দরজা খুলে গেলেও, সম-বিচার হয় না। একটা ছেলে যে কাজ যেরকম পারদর্শিতায় করে দশে নয় পাবে, ঠিক সেই এক কাজ সমান দক্ষতায় সমানভাবে করলেও মেয়েটিকে দেওয়া হবে দশে সাত। সবটাই যে পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র তা নয়, 'মেয়েরা পারে না অথবা ততটা পারে না'— ভাবনাটা এমনভাবে মনে গেঁথে আছে যে, এমনটা ঘটে যায়। ইন্দ্রা নুয়ি-রা শুধুই ব্যতিক্রম।'
রুচিকা বলল, ''তোকে ওপরে ওঠার মইয়ের সেই ধাপগুলোয় উঠতেই দেওয়া হবে না, যেখানে পৌঁছলে তুই ইন্দ্রা নুয়ির মতো একটা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হবি।''
মন খারাপ হয়ে যায়। বাড়ি ফিরি এসি বাসে। জানলার ধারটা রোজই পেয়ে যাই। কত আলোই না লাগানো হয়েছে রাস্তায়। এক বুক মন খারাপ নিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবি, এত আলোর একটুখানি 'এদিকে' আসুক না!
পরের দিন সকালে গিয়েই এমডি স্যরের নোটিস দেখলাম। স্যর এক্সচেঞ্জ মিটিং ডেকেছেন। মহিলা কর্মীদের। শুক্রবার সকাল ন'টা। ভিতরে-ভিতরে উত্তেজনা। এক্সচেঞ্জ মিটিংটা আবার কী! আগে তো শুনিনি। এক্সচেঞ্জ যখন, তখন নিশ্চয়ই অন্যদেরও বলার সুযোগ থাকবে। উনি মেয়েদের মতামত শুনবেন? মনে উত্তেজনা আর মুখে হাসি নিয়ে কফিতে চুমুক দিচ্ছিলাম। প্রদীপ্তদাকে দেখেই মনে হল, প্রদীপ্তদা নিশ্চয়ই কারণটা বলতে পারবে।
''এমডি স্যর সদ্য ইউরোপ থেকে ফিরেছেন। অনেকগুলো দেশে গিয়েছিলেন। কাজে। হতে পারে, এটা কর্পোরেট গ্লোবাল ফান্ডা।''
''ইসুটা কী?''
''কী করে বলব?''
''অল উইমেন মানে তো প্যারা-স্টাফরাও?''
''ইসু জানলে তোরা কী বলবি, তার একটা প্রস্তুতি নিতে পারতিস। এই তো? না হলে, অন্ধকারে ঢিল ছোড়া,'' একটু থেমে প্রদীপ্তদা আবার বলল, ''ধরে নে, তোরা নতুন ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছিস।''

এই প্রথম এমডি স্যারের সঙ্গে মিটিং। এই প্রথম বোর্ডরুমে ঢোকা। বোর্ডরুমে ঢুকেই বুঝে গেলাম কোনটা এমডি স্যারের চেয়ার। আমরা স্যারের ডানদিক-বাঁদিকে অনেকগুলো চেয়ার খালি রেখে বসলাম। এমডি স্যারের থেকে যতটা দূরে বসা যায়! একটু পরে এমডি-র অফিস স্টাফেরা এসে বললেন, ‘‘না, সামনের দিকে এতগুলো চেয়ার খালি রাখা যাবে না। ম্যাম, আপনারা এগিয়ে আসুন।’’
সাপোর্ট স্টাফের মহিলারা প্রত্যেকের সামনে ছোট প্যাকেজড জলের বোতল রাখল, কেউ ঘরে রুম ফ্রেশনার ছড়াল, কেউ এমডি স্যারের চেয়ার মুছে-টুছে তাঁর নির্দিষ্ট জলের গ্লাসটি এনে রাখল। সোনালি রিম দেওয়া জলের গ্লাসটি ফিনফিন করছে, এত স্বচ্ছ যে তার ভিতর দিয়ে ওপার দেখা যায়। তার আকৃতিটা ভারী চমৎকার। তলাটা সামান্য চাপা, উপর দিকটা মানানসইভাবে ছড়ানো। এসব শেপের গ্লাসের কোনও নাম আছে হয়তো। ব্র্যান্ডেডও মনে হয়। তাঁর কোস্টারটিও ভারী চমৎকার। যখন জলের গ্লাসটা কোস্টারের উপর বসাচ্ছিল, তখন দেখলাম সেটা সেরামিকের আর মাঝখানটা কেমন যেন মনে হল, ঝিনুকের। ধার দিয়ে গোল্ড বর্ডার। সোনালি প্লেটিং। তিনি বোধ হয় খুব শৌখিন। বোর্ডরুমে টাটকা ফুল। লাল, গোলাপি, হলুদ কারনেশন আর জিনিয়াগুচ্ছ বোর্ডরুমটিকে উজ্জ্বল করেছে। এসব দেখতে দেখতে টেনশন কখন উধাও হয়ে গেল।
সাপোর্ট স্টাফরাও সবাই এসে বসলেন। উনি ঢুকতেই আমরা উঠে দাঁড়ালাম। সমস্বরে স্কুলের মতো ‘গুড মর্নিং’ বললাম। পাল্টা ‘শুভ সকাল’ জানিয়ে ‘ডিয়ার লেডিজ়’ বলে শুরু করলেন। কিন্তু তারপর বাংলায় চলে গেলেন। উনি কোনওদিন অফিসে বাংলা বলেছেন বলে শুনিনি।
‘‘আমাদের কোম্পানিতে আগে কেবল রিসেপশন ও সাপোর্ট স্টাফ ছাড়া অন্য জায়গায় মেয়েদের নেওয়া হত না। এখন আর তা নেই। আমরা সব জায়গাতেই মেয়েদের নিচ্ছি। প্রোমোশনও দিচ্ছি....’’
ওইটুকু শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। ‘প্রোমোশন দিচ্ছি’ কথাটার মানে কী? বিনা কাজে যোগ্যতা ছাড়াই ‘দিচ্ছি’? তিনি বলে চলেছেন....
‘‘কোম্পানিতে বিশাখা কমিটি করা হবে। আমার বিশ্বাস, এই কোম্পানিতে এমন কিছু ঘটবে না যাতে বিশাখা কমিটিকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের যা সুনাম, তা অটুট থাকবে....’’
স্বীকার করতে হবে, তাঁর বলার ধরনটি সুন্দর। শব্দচয়নে মুনশিয়ানা আছে। ভাল বলেন।
হঠাৎ কয়েক সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা। আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার মন অন্য কথা ভাবছিল। কথার জাল বিছিয়ে উনি কী বলতে চাইলেন? কোন ইঙ্গিত দিলেন? কোনওদিন কোনও ঘটনা যদি ঘটেও থাকে তাহলেও কোম্পানির সুনামের কথা ভেবে, কেউ যেন বিশাখা কমিটিতে মুখ না-খোলে? নাকি পছন্দের পুরুষ কর্মীটির বিরুদ্ধে... মেয়েদের সুরক্ষা...
গত কয়েক মিনিট যে আমি কিছু শুনছিলাম না, তা কি উনি বুঝে গেলেন? না, তা মনে হল না। উনি জল খেলেন। তারপর...
‘‘আমাদের অফিসে মহিলা কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে। তাই তাঁদের দিকে আমাদের আরও নজর দিতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই মেনস্ট্রুয়াল লিভের কথা শুনেছেন। আমরা কোম্পানিতে সেটা চালু করতে চলেছি। ওই সময়ে প্রতি মাসে আপনারা শরীর বুঝে বাড়তি ছুটি নিতে পারবেন। পাওনা ছুটি কাটা যাবে না। আপনারা...’’
হাততালির ঝড় বয়ে গেল। বাকি কথা সেই ঝড়ে উড়ে গেল।
‘‘থ্যাঙ্কিউ। এ নিয়ে আপনাদের কারও কিছু বলার থাকলে বলুন।’’
আমি উঠে দাঁড়াতেই অনেক কপালে ভাঁজ পড়ল। চোখে সন্দেহের চাউনি। নিজেকে বললাম, ‘রোদসী, ভয় পেয়ো না। উনি সুযোগ দিয়েছেন। হাততালির আওয়াজ এসেছিল পেছন থেকে। সাপোর্ট স্টাফদের হাততালির জন্যে মেয়েদের বিষয়টি তুমি গুলিয়ে ফেলো না। বুঝিয়ে দাও, মেয়েরা বিশেষ ছাড় চায় না, সুবিধেও না। বলো, মেয়েরা সমান কাজ করবে, সমান মাইনে... মাইনের কথাটা কি বলা উচিত হবে?’
আমি শুরুটা করলাম ইংরেজিতে, ‘‘স্যর, আই থিঙ্ক, হোয়াট আই উইল সে ইন দ্য নেক্সট ফিউ মিনিট্স, উইল বি আওয়ার ভয়েস। রেসপেক্টেড স্যর, মাই ডিয়ার কলিগস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস...’’
আজ শীর্ষ ম্যানেজমেন্টকে বোঝাতে হবে, আমাদের মাথাও সমান চলে। তাই গুচ্ছের রাউন্ড পেরিয়ে চাকরি পেয়েছি। ওঁকে বোঝাতে হবে, প্যারা-স্টাফের হাততালি সঠিক জায়গায় পড়েনি। কোথায় হাততালি দিতে হবে, তা ওরা এখনই জানতে পারবে।
এবার আমি বাংলায় বলতে শুরু করলাম। ‘‘স্যর, আমরা কোনও বাড়তি সুবিধে চাই না। মেনস্ট্রুয়েশন কোনও অসুস্থতা নয়। যদিও স্যর, আজ আপনি কথাটা তুললেন বলে জানাচ্ছি, ওই সময় আমাদের কারও প্রথম, কারও বা দ্বিতীয় দিন পেটে বা কোমরে বা পায়ে ব্যথা হয়। তেমন হলে আমরা
প্যারাসিটামল খাই। কাজও করি। অসুবিধে হয় না। আর বেশি কিছু হলে তো স্যর, মেডিকেল লিভ আছে। রেসপেক্টেড স্যর, সেটা সবার জন্য।’’
এবার আমি মোক্ষম কথাটা বলা শুরু করলাম, ‘‘স্যর, আপনি মেয়েদের বাড়তি ছুটি দিতে চাইলে, প্রয়োজনে মেটারনিটি লিভ বাড়িয়ে দিন। লিভ উইথ পে। স্যর, আইন মেনে যে ছুটি দেওয়া হয়, তা অনেক সময় যথেষ্ট নয়। শিশুর জন্যে মাকে আরও একটু বেশি ছুটি দিলে, আপনি দেশের উপকার করবেন। তাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরই ভাল হবে। স্যর, মায়েরা যদি তার শিশুকে আরও কয়েকটা মাস বেশি ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়াতে পারে তা হলে সবল, স্বাস্থ্যবান ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি হবে। যে মা ব্রেস্ট মিল্ক নিয়ে অফিস করে, তার কী কী হয়, আপনি কি জানেন স্যর? স্যর, এসব কথা সোজাসাপটা বলতে বাধ্য হলাম। কিছু মনে করবেন না স্যর। আট বা ন’মাস বয়স থেকে শিশু সলিড খাবার খায়। তখন একজন মাকে সব ক’টা ফিড ব্রেস্ট মিল্ক না-দিলেও চলে। বছর দুয়েক আগে মেটারনিটি লিভ বাড়ানো হয়েছে। তবু মনে হয়, বাচ্চার জন্মের আগে দেড়-দু’মাস, আর পরে অন্তত ছ’মাস ছুটি দিলে ভাল হয়। স্যর, কোনও কোনও মেয়ে প্রেগন্যান্ট অবস্থায় ন’মাসেও কাজ করে। এটার জন্য, মায়ের বিচারবুদ্ধির ওপর ভরসা রাখুন। তারা শরীর বুঝেই ছুটি নেবে। মেয়েরাও কাজ করতে ভালবাসে, তারাও একজন পুরুষের মতোই কমিটেড। দুধের শিশুকে বাড়িতে রেখে যে মা কাজ করে, তার থেকে আপনি একশো শতাংশ পাবেন না। কারণ সে তার মা-সত্তাকে বাড়িতে ফেলে আসতে পারে না। স্যর, আই হোপ, মাই ডিয়ার কলিগস উইল এগ্রি। অ্যান্ড এভরিওয়ান এলস টুউউ।’’
স্যর বললেন, ‘‘দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স উইল ডিসাইড। থ্যাঙ্ক ইউ অল।’’
স্যর বেরিয়ে গেলেন। আমরা উঠে দাঁড়ালাম। বিশাখাদি তখনও বসে। আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে।

৪

সেদিন উইকএন্ড। বিশাখাদি বলল, ‘‘আজ অনেকবার কফি খাওয়া হয়েছে। চা খাব।’’

আমরা একটা টি-বারে গেলাম। কেউ কোনও স্ন্যাক নিতে রাজি হল না। কারওই মুড নেই। বিশাখাদি আমাকে বলল, ‘‘রোদসী ,তুই আমার কথা কেন বলতে গেলি? আমার জন্যে তুই যা করলি, সেটা ঠিক হল না। না তোর পক্ষে, না আমার পক্ষে। এটা অফিস, আমরা চাকরি করি।’’

‘‘আমি তোমার জন্যে কেন করব? তোমার কি আবার বাচ্চা হবে?’’ সকলে একচোট হাসল।

অর্ণা বলল, ‘‘তুই অত কথা বলবি কে জানত! মেনস্ট্রুয়াল লিভ নিয়ে তুই একশো ভাগ ঠিক। আমরা স্কুল করলাম, কলেজ করলাম, পোস্ট গ্র্যাড করলাম, কত শত পরীক্ষা দিলাম। কোনওদিন মেনস্ট্রুয়েশন হয়নি? নাকি ছুটি নিয়ে বাড়ি বসেছিলাম? তা ছাড়া দ্যাখ না, যেসব স্পোর্টস উইমেন আছেন, তাঁদের খেলার সময় কারও মেনস্ট্রুয়েশন হয় না?’’

রুচিকা বলল, ‘‘সকলে চুপ ছিল, তোর কী দরকার? তোর কথায় সব পালটে যাবে?’’

‘‘আমার মাথা গরম হয়ে গেল। মেনস্ট্রুয়াল লিভ দিয়ে উনি বলবেন, এই তো, মেয়েদের প্রত্যেক মাসে ছুটি নিতে হয়। কোনওদিন গোলমাল হলেই এমডি স্যর নিজেই প্রশ্ন তুলবেন, নিয়ম করা হয়েছে বলেই ওরা ছুটি নেবে?’’

‘‘ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করে কেউ টিকতে ...’’

‘‘ঝগড়া নয়। উনি মতামত চেয়েছেন, আমি জানিয়েছি। সিম্পল।’’

আমি স্কুল-কলেজে কোনওদিন ডিবেট, ডিসকাশনে অংশ নিইনি। নিজের বিশ্বাস থেকে কথা বললে বাগ্মিতার মতো গুণ লাগে না। না হলে, এমডি স্যরের সামনে কেউ এত কথা বলতে পারে? ভয় আর দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে। ঘুম আসছিল না। এপাশ ওপাশ করছিলাম। মাঝের ক’টা দিন কী করে যে কাটল! বেশি রাতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

‘‘ম্যাম, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু... অ্যাট ফোর থার্টি ইন দ্য আফটারনুন।’’

ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। ওহ! যাক।

৫

সোমবার এসে যেমন ল্যাপটপে লগ ইন করি, করলাম। কিন্তু এই ভাঙাচোরা মন নিয়ে কাজ করা যায়? কারও দিকে তাকাচ্ছিলাম না। চোখ দুটো মনিটরের উপর নিবদ্ধ। মন নয়। সে ভয়ের ছুরিতে শান দিচ্ছে। একবারও চা-কফি খেতে উঠলাম না। অর্ণারা সবই বুঝতে পারছে। ওদের সঙ্গেও কোনও কথা বিনিময় হয়নি। কাজের হল ছেড়ে একবারও উঠিনি। কথা আর কী করে হবে? এমডি ইস্তফা দিতে বললে, সকলের সামনে দিয়ে বেরোব কী করে? পাহাড়-প্রমাণ অপমান। ব্যাগফ্যাগ রেডি করে এমডি-র পিএ-র অফিসে রাখব? উনি কি কিছু মনে করবেন? প্রশ্ন করবেন? ইস্তফার চিঠি একেবারে লিখে এমডি-র কাছে যাব। ওঁর বলা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিয়ে ব্যাগ কাঁধে সাঁ করে নেমে যাব। লিফ্টের জন্যে অপেক্ষা করব না। লিফ্টের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে! বেরোনোর মুখে দারোয়ানের হাতে লকারের চাবিটা দিয়ে যাব।

লাঞ্চ পর্যন্ত কিছুই হল না। প্রবল অস্বস্তি নিয়ে বসে আছি। একটু পরে আমার কল আসবে। কনফারেন্স হবে। মেল খুলে বসে থাকতে পারি না। মাঝে মাঝেই চেক করতে হয়। তখন পারব না। তখন যদি এমডি স্যর ডাকেন? আজ এত দেরিতে কনফারেন্স হতে চলেছে যে, শেষ হতে সাড়ে আটটা বাজবে। কনফারেন্স কলে মগ্ন হয়ে গেলাম। কনফারেন্স কলের সময় মন খারাপ কি ভাল, টেনশন আছে না নেই— এসব নিয়ে মাথা ঘামানো যায় না। যখন শেষ হল, কাচের জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকার। কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ন’টা বাজতে মিনিটপাঁচেক বাকি। সব বন্ধটন্ধ করে বেরোলাম। এতক্ষণ অন্য কথা মাথায় আসেনি। কী হল! আমাকে এমডি ডাকলেন না? ইস্তফা? লিফ্ট দিয়ে নেমে দেখি, রিসেপশনে বিশাখাদি বসে আছে। পাশে অর্ণা, মোনালি, রুচিকা। সকলের মুখ থমথমে। তা হলে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। আমি কলে থাকায় জানানো হয়নি। ওরা জেনে গেছে! বিশাখাদি বলল, ‘‘চল। যাই।’’

‘‘কোথায়? গুনগুন তা হলে তো তোমার দশটার ফিডটাও পাবে না? যা বলার এখানেই বলো।’’

গম্ভীর মুখে বিশাখাদি বলল, ‘‘চল! আমার বাড়িতে। যা শোনার সেখানে শুনবি।’’

‘‘আমার এই টেনশন সহ্য হচ্ছে না। তোমরা এমন মুখ গম্ভীর করে আছ কেন? কিছু বলো।’’

‘‘গুনগুনকে খাওয়াতে হবে। দেরি করিস না।’’

৬

পাঁচজন বলে দুটো ক্যাব নিতে হল। বিশাখাদি বাড়ি ঢুকে রান্নার দিদিকে বলল, ‘‘ওদের জন্যে কিছু করো। আর চা। হাফ কাপ করে। আর বেশি কিছু দিয়ো না। তা হলে ডিনার খেতে পারবে না।’’

আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। আবার ডিনার! অর্ণা আমার স্কুলের বন্ধু। সে পর্যন্ত আমাকে কিছু বলছে না! বিশাখাদি স্নান সেরে গুনগুনকে নিয়ে এল। আমাদের সামনে আর কী লজ্জা! তবু একটা স্কার্ফ জড়াল।

‘‘আর কতক্ষণ তোমরা চুপ থাকবে? আমার হার্ট অ্যাটাক হওয়া পর্যন্ত?’’

গুনগুনকে খাওয়ানো শুরু করে বিশাখাদি বলল, ‘‘এ সবের জন্যে তুই দায়ী....’’

আমি চুপ। বিশাখাদিও চুপ। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, আমাকে কী বলা হবে।

মিনিটখানেক পর আবার বিশাখাদি শুরু করল, ‘‘আমাকে এমডি ডাকলেন। সন্ধের মুখে। জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার বাচ্চার কত মাস হল?’

‘‘‘সাড়ে চার হয়ে গেছে।’

‘‘‘যতদিন না আপনার বাচ্চা সলিড খেতে শুরু করবে, ততদিন আপনার ছুটি। কিন্তু প্রয়োজনে অফিসে আসবেন। আপনার বাড়ি কাছে। কোথাও আটকালে আসতে হবে। দরকারে, যে আপনার কাজ সামলাবে তাকে ফোনে ইনস্ট্রাকশন দেবেন। ভুল যেন না হয়।’’’

বিশাখাদি বলে চলল, ‘‘তখন আমার মুখ থেকে কথা সরছে না। আমি বললাম, ‘ইয়েস স্যর, নো প্রবলেম। ওর ফিডের মাঝখানে আসতে আমার কোনও অসুবিধে নেই স্যর। আর আমার মেয়ে খুব লক্ষ্মী। খাওয়ার সময় খেতে পেলে একটুও কাঁদে না স্যর।’’’

বিশাখাদি থামছে না। আমাকে জড়িয়ে ধরল।

‘‘আমি এমডির সামনে বড্ড বেশি কথা বলে ফেললাম। কিন্তু আনন্দ ধরে রাখতে পারছিলাম না। বাচ্চার দুধ ফেলে দিতে...’’

এবার বিশাখাদি মুখ ঢাকল। দু’চোখে জল!

আমারও গলায় কী যেন একটা দলা আটকে গেল।

কান্নার না হাসির!

অলংকরণ: বৈশালী সরকার

ওয়ার্ড্রোবই ‘স্লিমিং পিলস’

সঠিক পোশাক এবং অ্যাকসেসরিজ় থাকলে, বাড়তি ওজন নিমেষে ঢেকে ফেলতে পারবেন! ভারী চেহারায় কী ধরনের পোশাক মানানসই? উত্তর রইল এবারের প্রতিবেদনে।



কাট এবং কালার

ভারী চেহারায় ফিগার কারেকশনের জন্য গাঢ় রং আদর্শ। গাঢ় নীল, কালো, মেরুন, বেগুনি, গাঢ় সবুজ... এই ধরনের রঙে আপাতভাবে স্লিম দেখাবে। হালকা রঙের পোশাক তাই এড়িয়ে চলুন। একান্তই পরতে চাইলে, গাঢ় রঙের বর্ডার রয়েছে, এমন পোশাক পরতে পারেন। খুব জমকালো প্রিন্ট, উজ্জ্বল রংও ফিগার কারেকশনের জন্য ভাল নয়। সলিড রং, ছোট প্রিন্টস হলে তা বাড়তি ‘ওয়েট’ অ্যাড করবে না। পোশাকের কাট নিয়েও সতর্ক থাকুন। আপারবডি ভারী হলে ভি-নেক বা প্লাঞ্জড নেক ভাল। এতে নেকলাইনেই মূল ফোকাস থাকবে। লোয়ারবডি ভারী হলে একটু লম্বা ঝুলের একরঙা টপ-ট্রাউজ়ার্সের সেট বেছে নিতে পারেন। ড্রেসের ক্ষেত্রে এমন কাট বেছে নিন, যাতে কোনও ডিফাইন্ড ওয়েস্টলাইন নেই। এতে পেটে মেদ থাকলেও, তা ঢাকা পড়ে যাবে।



পারফেক্ট ফিট

খুব লুজ় ফিট হলেও যেমন আরও বেশি ভারী লাগবে, তেমনই টাইট ফিটেড পোশাকে স্থূলতা স্পষ্ট বোঝা যাবে। তাই পোশাকের ফিটের প্রতি বাড়তি গুরুত্ব দিন। ড্রেসের ক্ষেত্রে বডিকন বা করসেট ফিট এড়িয়ে চলুন। বরং কাফতান বা কিমোনো ড্রেস বেছে নিন। এ-লাইন ড্রেসও ভাল। পোশাকের ঝুল নি-লেংথ বা তার নিচে হলে ভাল। ডেনিমেও স্কিনি বা স্লিম ফিটের পরিবর্তে মম ডেনিম, বয়ফ্রেন্ড ফিট, বুটকাট বা বেলবটমস ভাল লাগবে।

চিরসঙ্গী হিলস

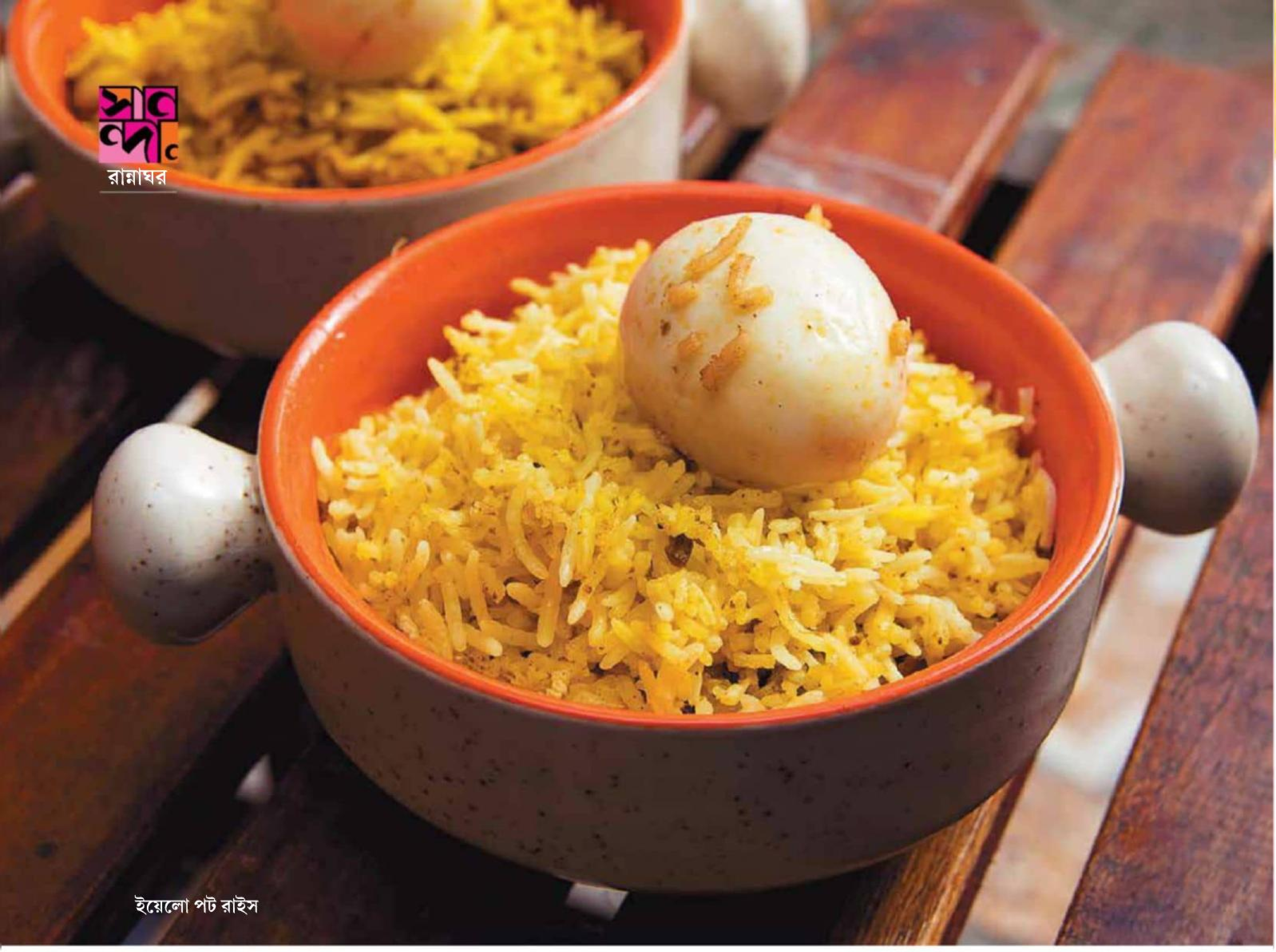
মনে রাখবেন, উচ্চতা যত বাড়বে, দেখতে তত রোগা লাগবে। তাই হিলস পরতে কুণ্ঠা করবেন না। যত উঁচু হিলস হয়, ততই ভাল। কমফর্ট চাইলে প্ল্যাটফর্ম বা ওয়েজ বেছে নিন। এথনিক, ওয়েস্টার্ন সব পোশাকের সঙ্গেই মানানসই। আজকাল স্নিকার্সেও কিন্তু হিলস থাকে। ক্যাজুয়ালওয়্যার হিসেবে আদর্শ। এথনিকের সঙ্গে ওয়েজ মিউলস বা স্যান্ডল পরতে পারেন।





লেয়ারিং মাস্ট

ফিগার কারেকশন করার আর-একটি সহজ উপায় হল পোশাকের উপর কোনও ধরনের লেয়ারিং। ধরুন, হালকা রং, বোল্ড প্রিন্টস বা ফিটেড পোশাক পরতে চান। সেক্ষেত্রে উপরে নি-লেংথ বা লং জ্যাকেট পরে নিন। পোশাকে জমকালো প্রিন্ট থাকলে জ্যাকেট সলিড রঙা হতে হবে। অথবা সলিড রঙা পোশাকের সঙ্গে প্রিন্টেড জ্যাকেট নিন।



ইয়েলো পট রাইস

যত রং, তত গুণ!

নানা রঙের খাবার মানেই তাতে নানা গুণ! কালার স্কিম, স্বাস্থ্যের পরিমাপ মেনে প্ল্যাটার সাজালেন রেসিপি কিউরেটর এবং লাইফস্টাইল ব্লগার অনুশ্রীয়া পাল। স্বাদ নিলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

খাবারের প্লেটে যত রং থাকবে, তা তত স্বাস্থ্যকর— কথাটা সব ডায়েটিশিয়ানই বলে থাকেন। নানা রঙের ফল, সবজি, মশলা, শস্যতে প্রকৃতি এক এক ধরনের নিউট্রিশনাল এলিমেন্ট ভরে দিয়েছে। বিভিন্ন কালার পিগমেন্টে ভর্তি খাবার মানেই তা নানা ধরনের স্বাস্থ্যকর উপাদানে সমৃদ্ধ— ভিটামিন, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, ফাইবার, প্রোটিন। দৃষ্টিনন্দনও বটে! ভাবুন তো, এক-এক রকম কালার স্কিম মেনে যদি প্লেট সাজানো হয়, কত সুন্দর দেখতে হবে! এবার তাই সাজিয়ে দিলাম রংমিলান্তি খাবার। চেখে দেখা তো উপকারী বটেই, চোখে দেখেও সুখ!

হলুদ

ইয়েলো পট রাইস

প্রোটিনে ঠাসা ওয়ান-পট মিল। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে সাহায্য করে।



উপকরণ: বাসমতি চাল ১ কাপ, ডিম ২টো, কুচনো পেঁয়াজ ১টা, বড় টোম্যাটো ১টা (কুচনো), আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, শাহি গরমমশলাগুঁড়ো ২ টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, জিরেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, লাললঙ্কাগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, গোলাপজল ১ টেবলচামচ, ছোট এলাচ ২টো, লবঙ্গ ২টো, দারচিনি ১টা, কাঁচালঙ্কা ২টো, তেজপাতা ১টা, নুন এবং চিনি স্বাদমতো, জল পরিমাণমতো, রান্নার জন্য সরষের তেল।

প্রণালী: ডিম সেদ্ধ করে নিন। কড়াইয়ে



ঝিঙের খোসার ভর্তা

কোয়া দিন। ঝিঙের খোসাবাটা দিয়ে, নেড়েচেড়ে রাঁধতে থাকুন। মিনিটপাঁচেক পর তেল ছাড়তে শুরু করবে। মিশ্রণটা ডো-র মতো আঁটো হয়ে যাবে। এবার আঁচ বন্ধ করে দিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কালো

কালো চানার ভুনা

কাবুলি চানায় ভিটামিন, ফলিক অ্যাসিড, ফাইবার এবং নানা ধরনের খনিজ লবণ ঠাসা। ডায়েট ফুড হিসেবেও এর জুড়ি নেই।

উপকরণ: কাবুলি চানা ১ কাপ, চা-পাতা ১ টেবলচামচ, কোরানো আদা ১টা, জুলিয়েন করে কাটা আদা ১০টা, চেরা কাঁচালঙ্কা ২-৩টে, বড় টোম্যাটো ১টা (বাটা বা পিউরি করা), নুন এবং চিনি স্বাদমতো, গোটাজিরে ১ টেবলচামচ, জিরেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ২-৩ টেবলচামচ, রান্নার জন্য সরষের তেল।

প্রণালী: কাবুলি চানা ভিজিয়ে রাখুন

সরষের তেল গরম করে, ডিমগুলো হালকা লালচে করে ভেজে নিন। চাল পরিষ্কার করে ধুয়ে, জল ঝরিয়ে নিন। আধঘণ্টা রেখে, ভাত রান্না করে নিন। কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করুন (যে তেলটা ডিম ভাজার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, সেটাও কাজে লাগাতে পারেন)। গোটা মশলাগুলো সব দিয়ে দিন একে একে। তারপর পেঁয়াজকুচি আর আদা-রসুনবাটা দিন। ভাল করে রান্না করে নিন। সুগন্ধ বেরলে কুচনো টোম্যাটো দিন। নেড়েচেড়ে নিয়ে, শুকনো মশলাগুলো দিন। জল দিন দরকারমতো। রাঁধতে থাকুন, যতক্ষণ না কাঁচা গন্ধ চলে যায় এবং মশলা থেকে তেল ছাড়তে আরম্ভ করে। আবার প্রয়োজনমতো জল দিন। ডিমগুলো দিয়ে দিন। রান্না করুন ২-৩ মিনিট। এবার ভাতটা দিয়ে, ভাল করে মিশিয়ে নিন। একটুক্ষণ রাঁধুন। রান্না হয়ে গেলে উপর থেকে গরমমশলার গুঁড়ো আর গোলাপজল ছড়িয়ে, নামিয়ে নিন।

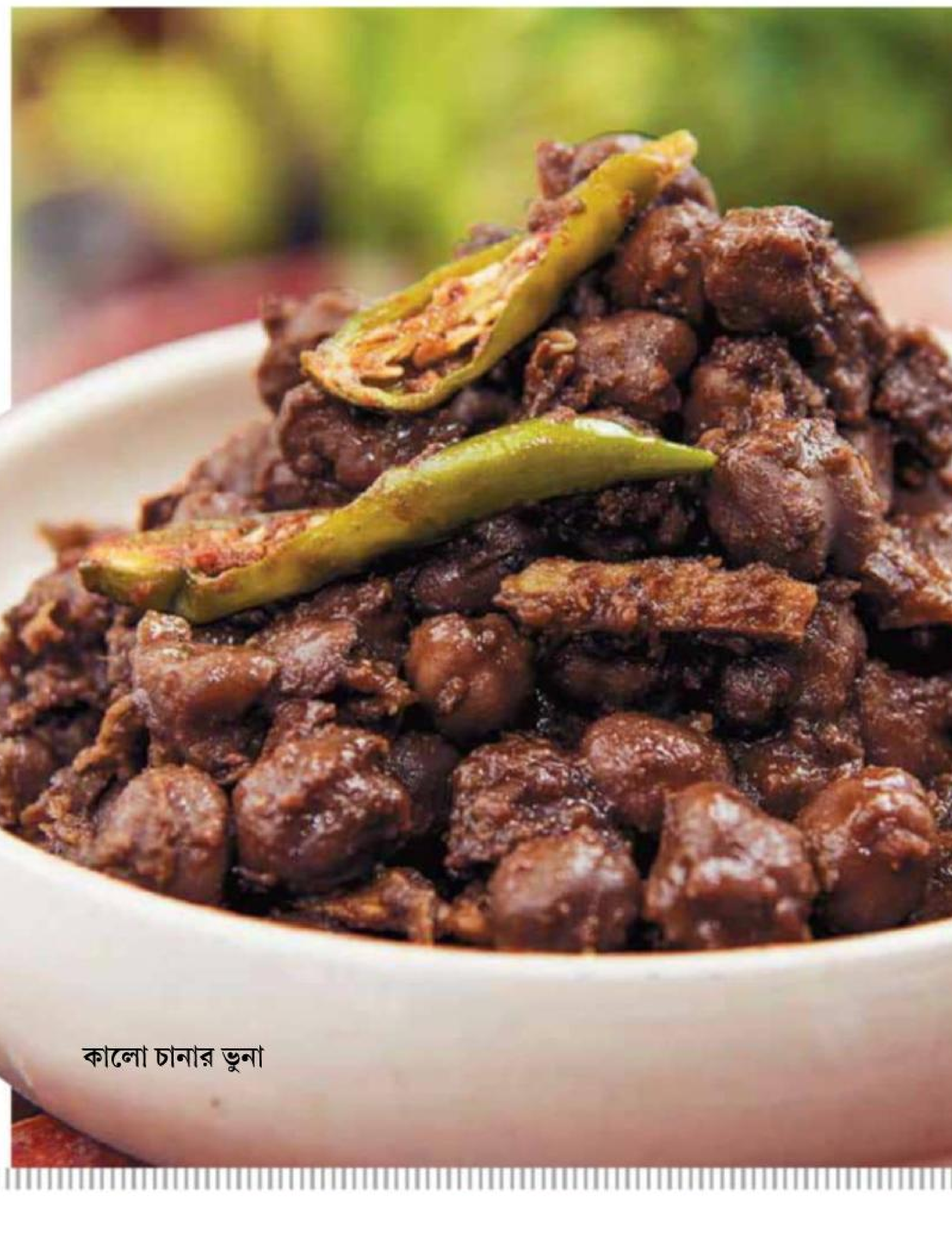
সবুজ

ঝিঙের খোসার ভর্তা

ঝিঙেতে ফাইবার, ভিটামিন সি এবং আয়রন রয়েছে। ক্যালরিও খুব কম।

উপকরণ: ঝিঙে ১-২টো, রসুন ৪-৫ কোয়া, গোটা লাললঙ্কা ২টো, কলোঞ্জি ১ চা-চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো, জল প্রয়োজনমতো, রান্নার জন্য সরষের তেল।

প্রণালী: ঝিঙের খোসা ছাড়িয়ে নিন। কড়াইয়ে পরিমাণমতো জল নিয়ে, তাতে নুন মেশান। গোটা লাললঙ্কা দিন তাতে, তারপর ঝিঙের খোসা দিন। ঠিক ৫ মিনিট ফোটান। বেশি ফোটালে খোসার রং নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর মিশ্রণটা ঠান্ডা করে, বেটে নিন। এবার কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করুন। গরম হলে, প্রথমে কলোঞ্জি, তারপর রসুনের



কালো চানার ভুনা



হেলদি অরেঞ্জ পোরিয়াল



পিঙ্ক রাকাম'স ট্রেজ়ার

সারারাত। পরদিন ধুয়ে নিন। প্রেশার কুকারে চানা আর প্রয়োজনমতো নুন দিন। জল এতটা দেবেন, যাতে ছোলার প্রত্যেকটা দানা ডুবে যায়। একটা পাউচে চা-পাতা ভরে, কুকারে দিয়ে দিন। ঢাকনা এঁটে, ৫-৬টা সিটি দিয়ে নিন। ভাপ বেরিয়ে গেলে, ছোলা একটা পাত্রে ঢেলে নিন। জলটা ফেলে দেবেন না, ওটা রান্নায় কাজে লাগবে। কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করে প্রথমে গোটাজিরে, তারপর কোরানো আদা দিন। কাঁচা গন্ধ কেটে গেলে, টোম্যাটোবাটা দিন। সবটা মিশে গেলে, ছোলা দিয়ে দিন। ছোলার গায়ে মশলা ভাল করে মেখে গেলে, ধনেগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, নুন আর চিনি মেশান। ছোলাসেদ্ধর জলটা দিয়ে দিন। এই জলেও কিন্তু নুন মেশানো রয়েছে! ঢাকা দিয়ে রান্না করুন ৫ মিনিট। জল শুকিয়ে, মশলা আর চানা ভালভাবে মিশিয়ে গেলে, জুলিয়েন করে কাটা আদা আর চেরা কাঁচালঙ্কা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

কমলা

হেলদি অরেঞ্জ পোরিয়াল

গাজর ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে।

উপকরণ: গাজর ১টা (কিউব করে কাটা), নারকেলকোরা ২ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কা ২টো (কুচনো), বড় পেঁয়াজ ১টা (কুচনো), গোটাসরষে ১ চা-চামচ, গোটাজিরে ১ চা-চামচ, নুন এবং চিনি স্বাদমতো, জল পরিমাণমতো, রান্নার জন্য সাদা তেল।

প্রণালী: কড়াইয়ে তেল গরম করুন। একে একে জিরে, সরষে, পেঁয়াজকুচি, চৌকো করে কাটা গাজর, কাঁচালঙ্কাকুচি, নুন আর চিনি দিন। ঢাকা দিয়ে, রান্না করুন। মাঝে একবার ঢাকনা খুলে ৪-৫ চামচ জল মিশিয়ে দেবেন। গাজর রান্না হয়ে, নরম হয়ে গেলে, নারকেলকোরা দিয়ে দিন। আঁচ বন্ধ করে, ঢাকা দিয়ে রাখুন। মিশে গেলেই পোরিয়াল তৈরি। লেমন রাইস তো বটেই, এমনি ভাত বা রুটির সঙ্গেও ভাল লাগবে।

গোলাপি

পিঙ্ক রাকাম'স ট্রেজ়ার

হার্টের অসুখ থেকে সুরক্ষা দেয় বিট। রক্তসঞ্চালন ভাল রাখে।

উপকরণ: বিট ১টা, ছোলার ডাল ১ টেবলচামচ (ভিজিয়ে রাখা), বেসন ১ কাপ, কুচনো কাঁচালঙ্কা ১-২টো, জোয়ান ১ চিমটে, নুন এবং চিনি স্বাদ অনুযায়ী, জল প্রয়োজনমতো।



প্রণালী: বিট কুরিয়ে, ২ ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর রসটা বের করে নিন চিপে। একটা পাত্রে বেসন ঢেলে, বিটের রসের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। একে একে দিন কাঁচালঙ্কা, আদা, নুন, চিনি আর জোয়ান। খুব ভাল করে মিশিয়ে নিন। জল ঢালুন এতে (জলটা স্বাভাবিক তাপমাত্রার হওয়া চাই)। মিশিয়ে, ব্যাটার বানিয়ে নিন। খুব ঘন বা খুব পাতলা, কোনওটাই যেন না হয়। তাওয়া বা ননস্টিক প্যান গরম করে, গোলা ঢেলে নিন সাবধানে। প্যানকেক ভেজে ফেলুন। আচার, লঙ্কাভাজা বা সবুজ চাটনির সঙ্গে ভাল লাগবে পিঙ্ক রাকাম'স ট্রেজ়ার।

বাদামি

ব্রাউন ব্যানানা ব্লাস্ট

মেটাবলিজ়ম এবং ইমিউন হেল্‌থ, দুইই ভাল রাখে।

উপকরণ: বড় কলা ২টো, মাখন ১ টেবলচামচ, ডিম ১টা, চিনি $^1/_4$ কাপ+ ১ টেবলচামচ, তেল $^1/_4$ কাপ, দুধ $^1/_2$ কাপ, ময়দা ১ কাপ, সুইটেন্ড কোকো পাউডার ৩ টেবলচামচ, বেকিং পাউডার ১ চিমটে।

প্রণালী: কলাগুলো মাঝখান থেকে আধাআধি করে কেটে নিন। ননস্টিক প্যানে ১ টেবলচামচ মাখন দিন। মাখন গলে গেলে, ১ টেবলচামচ চিনি দিন। চিনিতে রং ধরে ক্যারামেলাইজ় হয়ে গেলে, চার টুকরো কলা দিয়ে দিন প্যানে। আঁচ কমিয়ে দিন। ক্যারামেলাইজ়ড সসে কলাটা রান্না হতে দিন। অন্যদিকে একটা পাত্রে ডিম, বাকি চিনি আর তেল দিয়ে, হুইস্ক দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর দুধ মিশিয়ে, আবার হুইস্ক দিয়ে নেড়ে নিন ভাল করে। অন্য একটা পাত্রে ময়দা ছেঁকে নিন। তাতে কোকো পাউডার আর বেকিং পাউডার দিয়ে, ভালমতো মিশিয়ে নিন। এবার ডিম-দুধের মিশ্রণে ময়দার মিশ্রণ ঢেলে দিন। আলতো হাতে মিশিয়ে নিন, যাতে মাঝারি ঘনত্বের ব্যাটারের মতো তৈরি হয়। এই মিশ্রণটা কলার উপর আলতো করে ঢেলে দিন। ঢাকা দিয়ে, আঁচ কমিয়ে দিন। ১৫ মিনিট রান্না হতে দিন। ১৫ মিনিট পর ঢাকনা খুলে, কলার গায়ে ছুরি বা টুথপিক ঢুকিয়ে দেখুন। যদি ছুরি বা টুথপিক বের করার পর পরিষ্কার থাকে, তার মানে বুঝবেন হয়ে গিয়েছে। না হলে আরও মিনিটপাঁচেক রান্না হতে দিন। তারপর ডেসার্টটা উলটে একটা প্লেটে ঢেলে নিন। স্লাইস করে কেটে, জমিয়ে খান!



ব্রাউন ব্যানানা ব্লাস্ট

স্বাস্থ্যকর খাবার মানেই স্বাদহীন, এমন মোটেই নয়। প্রতিটি প্রাকৃতিক খাবারেরই যেমন নিজস্ব রূপ এবং গুণ থাকে, তেমনই থাকে নিজস্ব স্বাদও। সেই স্বাদগুলোকে যথাসম্ভব বজায় রেখে রান্না করতে পারলেই কেল্লা ফতে!



লাল

রেড থাক্কালি দোসাই

টোম্যাটো হার্ট হেল্‌থ ভাল রাখে, রোদে পোড়ার থেকে সুরক্ষা দেয়। ক্যানসার প্রিভেনশনেও কাজে আসে।

উপকরণ: চাল ২ কাপ, কলাইয়ের ডাল $^1/_2$ কাপ, চিঁড়ে $^1/_4$ কাপ, মেথিবীজ ১ চা-চামচ, টোম্যাটো ৩-৪টে (খোসা ছাড়িয়ে বাটা বা পিউরি করা), কাশ্মীরি লাললঙ্কাগুঁড়ো $^1/_2$ চা-চামচ, নুন এবং চিনি স্বাদমতো, রান্নার জন্য সাদা তেল।

প্রণালী: চাল আর ডাল খুব ভাল করে অনেকবার করে ধুয়ে নিন। তারপর চাল, ডাল এবং মেথির বীজ একই পাত্রে ভিজিয়ে রাখুন সারারাত। পরদিন ভাল করে ধুয়ে নিন। মিক্সারে চাল, ডাল আর মেথিবীজ দিন। চিঁড়েও দিয়ে দিন। প্রয়োজনমতো জল মেশান, যাতে ঘনত্ব বজায় থাকে। টোম্যাটোবাটা, লাল লঙ্কাগুঁড়ো

বেকিং সোডা বা ফ্রুট সল্ট ১ টেবলচামচ, কোরানো আদা ১ টেবলচামচ (চাইলে বাদ দিতে পারেন), ভাজার জন্য তেল।

প্রণালী: সুজি, তেল, চিনি আর নুন মিশিয়ে নিন। জল দিন। ব্যাটার বানিয়ে, ১৫ মিনিট রেখে দিন। হুইস্ক দিয়ে নেড়ে, আর একটু জল মিশিয়ে নিন। ব্যাটারটা মাঝারি ঘনত্বের হতে হবে। গোলাকার পাত্র বা বেকিং টিনে তেল মাখিয়ে রাখুন। বেকিং সোডা বা ফ্রুট সল্ট দিয়েই ব্যাটার ঢেলে দিন। হুইস্ক দিয়ে নেড়ে নিন। ব্যাটারটা যেন মসৃণভাবে থাকে টিনে। তলা-ভারী পাত্রে জল ফুটতে দিন। ফুটতে শুরু করলে, বেকিং টিনটা জলে বসিয়ে দিন। ঢাকা দিয়ে, ১৫ মিনিট রান্না হতে দিন। ধোকলা তৈরি না হলে আরও ৫ মিনিট হতে দিন। আঁচ বন্ধ করে, প্লেটে ঢেলে কেটে নিন। আর একটা পাত্রে তেল গরম করে, সরষে আর কাঁচালঙ্কা দিন। সরষে ফাটতে শুরু করলে, চিনি আর জল দিন সামান্য। ধোকলার উপর এই মিশ্রণটা চামচে করে ঢেলে দিন।

খাবারের গুণের সঙ্গে সঙ্গে রূপকেও মাথায় রেখে পাত সাজান, দেখবেন তা সকলের কাছেই আকর্ষক হবে!

যোগাযোগ: thebongtrippers@gmail.com
ছবি: স্বর্ণাভ মুখোপাধ্যায়


রেড থাক্কালি দোসাই

আর স্বাদমতো নুন দিন। তাওয়া বা ননস্টিক প্যান গরম করে, তাতে তেল মাখিয়ে নিন। হাতায় করে, সাবধানে ধীরে ধীরে গোলা ছেড়ে দিন তাওয়ায়। দু'পিঠ ভেজে নিন। সম্বর, নারকেলের চাটনি বা টোম্যাটোর চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন টোম্যাটো দোসা।

সাদা

স্নো-হোয়াইট ধোকলা

আয়রন এবং ম্যাগনেশিয়াম মেলে এই ধোকলা থেকে।

উপকরণ: সুজি ১ কাপ, গোটাসরষের দানা $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, চেরা কাঁচালঙ্কা ২-৩টে, জল পরিমাণমতো, নুন এবং চিনি স্বাদ অনুযায়ী,




স্নো-হোয়াইট ধোকলা

সানন্দা রিভিউ



নৃত্য

গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের শিষ্যা এবং ওড়িশি নৃত্যের জনপ্রিয় শিল্পী ও গুরু সুতপা তালুকদার 'রাজনর্তকী' কে প্রায় ১১ বছর পর মঞ্চে মূর্ত করে তুললেন সম্প্রতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্যের মধ্যে 'শ্যামা' বরাবরই সুতপার প্রিয় চরিত্র। 'শ্যামা' এবং 'পারিষদ'-এর মেলবন্ধনে তিনি কোরিয়োগ্রাফ করেছিলেন 'রাজনর্তকী'। 'মিউজ়িক' এই নৃত্যনাট্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা মণ্ডল, শ্রীকান্ত আচার্য, সুব্রত সেন প্রমুখ শিল্পী। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন শিল্পী তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। স্ক্রিপ্ট, কোরিয়োগ্রাফি এবং কস্টিউম ডিজ়াইন করেছেন সুতপা তালুকদার। ভাষ্যে ছিলেন পার্থ ঘোষ এবং গৌরী ঘোষ। প্রথম যাঁদের দিয়ে রেকর্ডেড হয়েছিল মিউজ়িক, তাঁরা আজ অনেকেই আমাদের মধ্যে আর নেই। দীর্ঘ বছর পরে সম্পূর্ণ উপস্থাপনাসহ নৃত্যনাট্য একই সঙ্গে নস্ট্যালজিয়া কিন্তু নাচের ঔজ্জ্বল্য এনে দিল রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে। শুধুই ওড়িশি নৃত্যশৈলীকে ব্যবহার করেননি সুতপা, তাঁর সঙ্গে মিশিয়েছেন রাবীন্দ্রিক স্টাইলও। এ ছাড়াও রয়েছে ক্রিয়েটিভ ইমপ্রোভাইজ়েশন। সব মিলিয়ে আবারও 'রাজনর্তকী'র শিল্পীরা ও সুতপা তালুকদার মুগ্ধ করলেন দর্শকদের। আলোর দায়িত্বে ছিলেন উত্তীয় জানা।

গান

সম্প্রতি 'যোধপুর পার্ক গীতিকা কালচারাল সোসাইটি'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল 'মনসুন মেলডিস'। এই সংস্থার কর্ণধার, চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা গানকে আরও বেশি করে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। প্রথমার্ধে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান। পরিবেশন করলেন চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত, প্রদীপ দত্ত এবং দীপাবলি দত্ত। প্রতিটি গানের সঙ্গে জুড়ে ছিল একটি গল্প, যা শোনালেন মৌনিতা চট্টোপাধ্যায়। গানের সঙ্গে ভরতনাট্যম, মোহিনীআট্টম, কথাকলি, ওড়িশি এবং ক্রিয়েটিভ নাচ পরিবেশন করেন প্রকৃতি বসু, রাজা দত্ত, গার্গী নিয়োগী, দীপ্তাংশু পাল, সুলগ্না রায় ভট্টাচার্য এবং সর্বোপরি, কোহিনূর সেন বরাট। দ্বিতীয়ার্ধে শোনা গেল 'সাওন' এবং 'ঝুলা'র মতো লাইট ক্লাসিক্যাল গান। উত্তরপ্রদেশের নানা স্থানে বর্ষাকালে গাওয়া হয় 'সাওন' এবং 'ঝুলা'। ঝুলন পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের দোলনায় দোলার মুহূর্তগুলিকে তুলে ধরা হয় 'ঝুলা'য়। গানগুলি শোনা গেল দীপাবলির কণ্ঠে। সঙ্গে কত্থক পরিবেশন করলেন রুদ্রাভ নিয়োগী এবং শতাব্দী ভৌমিক। এ ছাড়া চন্দ্রাবলী শোনান নজরুলগীতি 'শাওন রাতে যদি', রাগপ্রধান 'সখী সেদিন শ্রাবণে', হিমাংশু দত্তের সুরারোপিত আধুনিক 'বরষার মেঘ'। দ্বিতীয়ার্ধের শেষে ছিল ওয়েব সিরিজ় 'বন্দিশ ব্যান্ডিটস'এর জনপ্রিয় বন্দিশ, মেঘমল্লার রাগে 'গরজ গরজ আজ মেঘ'। শোনালেন দীপাবলি। সঙ্গে কত্থক পরিবেশন করলেন রুদ্রাভ। শেষে গান গাইলেন 'গীতিকা'র সদস্যরা। সংগীতায়োজনের দায়িত্বে ছিলেন সুব্রত বাবু মুখোপাধ্যায়,



পণ্ডিত বিপ্লব মণ্ডল, শৌর্য ঘটক, সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের হাতে প্রাণ পেয়েছিল গানগুলি। স্টেজ ডিজ়াইন করেন শিল্পী সায়ক রাজ। আলো এবং সাউন্ডের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে উত্তীয় জানা এবং কমল।



হায়দরাবাদের টেবল টেনিস খেলোয়াড় শ্রীজা আকুলা এবারের কমনওয়েলথ গেমসের অন্যতম সোনাজয়ী। ছোটবেলা থেকে গেমসের প্রস্তুতি...সব নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন মধুরিমা সিংহ রায়।

“কমনওয়েলথ গেমস জিতে এখনও সেলিব্রেট করতে পারিনি”

যে দেশে এখনও মেয়েদের পেশাদার খেলাধুলোয় নিয়ে আসার ব্যাপারে দ্বিধায় ভোগেন বাবা-মায়েরা, সেখানে ছোট্ট শ্রীজা আকুলাকে হাতে ধরে টেবল টেনিস শিখিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মা। তাঁদের ও মেয়ের অধ্যবসায়ের ফলও এসেছে হাতেনাতে! এবারে কমনওয়েলথ গেমসে যাঁরা উজ্জ্বল সোনাজয়ী, সেই তালিকায় জ্বলজ্বল করছে শ্রীজার নামও। টেবল টেনিসে শরৎ কমলের সঙ্গে জুটি বেঁধে সোনা জিতেছেন হায়দরাবাদের এই তরুণী। কতটা বদলেছে জীবন কমনওয়েলথ গেমসের পরে? সহজ হেসে উত্তর দিলেন শ্রীজা, ‘‘বিশেষ কিছুই বদলায়নি। ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল এমন প্রেস্টিজিয়াস কোনও মঞ্চে মেডেল জিতব! সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে, তাই খুব খুশি। তবে একটু দুঃখও আছে। সিঙ্গলস-এ শেষরক্ষা করতে পারলাম না বলে! মিক্সড ডাবলস জয়ও একইরকম আনন্দের যদিও। আমার বাবা-মা, কোচ সকলেই খুব খুশি। তবে সেলিব্রেট করতে পারিনি এখনও ঠিকমতো, জানেন। গেমসের পরেই দিল্লি গেলাম। তারপর আমদবাদে এলাম লিগ ম্যাচ খেলার জন্য। কালকেই বেরিয়ে যাচ্ছি আবার চেক রিপাবলিকের উদ্দেশ্যে (সাক্ষাৎকারের পরেরদিন)।’’ বাবা টেবল টেনিস খেলতেন। শ্রীজারা দুই বোন। দিদিকেই প্রথম টেবল টেনিস শেখাতে শুরু করেন তাঁদের বাবা। ‘‘ওকে দেখেই আমিও খেলতে শুরু করি। দিদি যখন ক্লাস ইলেভনে তখন খেলা ছেড়ে দেয়। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মনোযোগ দেয়। আমিই খেলতাম তখন। তবে ক্লাস টেনে ওঠার পরে বাবা-মা একটু দ্বিধায় ছিলেন, পড়াশোনা করব না খেলব! দিদি খুব সাপোর্ট করত। বাবা সরকারি চাকরি করতেন। কিন্তু খেলাধুলোর খরচ চালানোর জন্য সেই চাকরি ছেড়ে বেসরকারি চাকরিতে যোগ দেন বাবা। আমার কোচ সোমনাথ ঘোষের সঙ্গে প্রায় ১২ বছর ধরে ট্রেনিং করছি। আট বছর বয়স থেকেই টেবল টেনিসে হাতেখড়ি। ১১ বছর বয়সে ন্যাশনাল লেভেল ক্যাডেটে প্রথম মেডেল জিতি। প্রতিবছরই সুযোগ পেতাম আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার। কিন্তু ইয়ুথ ক্যাটিগরিতে অংশ নেওয়ার আগে অবধি কিছুতেই তৃপ্ত হচ্ছিলাম না। সবসময় মনে হত, বড় কিছু করতে হবে। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের



মতো জায়গায় মেডেল জিততে হবে। ১৮ বছর বয়স নাগাদ আমিও একটু সংশয়ে ছিলাম, টেবল টেনিসকে নিয়েই এগোব নাকি অন্য কোনও পেশা বেছে নেব! যদিও আমার কোচ, পরিবারের লোকেরা আমার সাফল্যে খুশি ছিলেন, কিন্তু আমি খুঁতখুঁত করছিলাম একটু। বি.কম নিয়ে পড়াশোনা করতাম, ভেবেছিলাম ভাল কোনও কলেজে সিএ পড়ব। সেসময়ে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরির অফার পাই। এই চাকরি আমাদের পরিবারে বেশ বড় ব্যাপার ছিল। আসলে, মধ্যবিত্ত পরিবারে তো একটু নিরাপত্তাহীনতা থাকেই। খেলাধুলোয় সারভাইভ না করতে পারলে কী হবে ইত্যাদি। পড়াশোনাতেও ভাল ছিলাম আমি। ক্লাস টুয়েলভে ৯৬ শতাংশ নম্বর পাই। পড়াশোনা আর খেলাধুলোর মধ্যে বেছে নিতে একটু দ্বিধা ছিল। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পরে দ্বিধা কেটে যায়। যেহেতু আর্থিক সংস্থানের দিকটি নিশ্চিত হয়ে যায়, পুরোপুরি খেলায় মনোযোগ দিতে শুরু করি। ২০ বছর বয়সে প্রথমবার


কমনওয়েলথের মঞ্চে

জাতীয় স্তরে সিনিয়র ক্যাটেগরিতে খেলি, প্রথম বছরেই সোনা জিতি। কিছু আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টও খেলি। তারপর তো কোভিড-লকডাউনে কেটে গেল অনেকটা সময়। তবে এর মাঝেও জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ, কমনওয়েলথ গেমসের জন্য প্রস্তুতি চলছিলই। লকডাউনে ফিটনেসের উপর ফোকাস করতে পেরেছিলাম আরও বেশি। বাড়িতে নিয়ম মেনে খাওয়াদাওয়া করতাম। মেন্টাল ট্রেনিং ক্লাসও করতাম। আমার ফিটনেস ট্রেনারও একজন বাঙালি! ওঁর সঙ্গেও ভিডিও কলে নিয়মিত কথা হত। সার্ভিস রিটার্ন, ফোরহ্যান্ড-সহ নিজের টেকনিকেও প্রচুর উন্নতি করি। এরপরে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ, আর তারপরে নিশ্চিত হয়ে যায় যে আমি কমনওয়েলথ গেমসের টিমে থাকব,'' বলেন তিনি। বাঙালি কোচ সোমনাথ ঘোষ শরৎ কমলকে অনুরোধ করেন শ্রীজার সঙ্গে পার্টনারশিপের জন্য। তারপরেই কমনওয়েলথ গেমসে জুটিতে সোনা! ''শরৎ কমল ভাইয়াকে আমি সবসময় অ্যাডমায়ার করি। ওঁর খেলার ধরন আমার প্রিয়,'' জানালেন তিনি। বাবা-মা, কোচের পাশাপাশি শ্রীজা কৃতিত্ব দিতে চান সরকারকেও। সরকার ও ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এখন অনেক অ্যাকাডেমিই গড়ে উঠছে, আর সেসব সাহায্য করছে তাঁর মতো আরও অনেক উঠতি প্রতিভাকেও। এই ব্যাপারটি একবাক্যে স্বীকার করলেন তাঁর কোচও। সরকারি উৎসাহের জন্য একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে খেলোয়াড়রা, বিশেষ করে মেয়েরা উঠে আসছে। জনপ্রিয় হচ্ছে অলিম্পিকস স্পোর্টস। বাঙালি কোচ, বাঙালি ফিটনেস ট্রেনার...একটু একটু কি বাংলা শিখছেন? ''একটু একটু বুঝতে পারি। কয়েকটা শব্দ। কিন্তু বলতে পারি না একদমই,'' হাসতে হাসতে জানালেন তিনি। ওমান, কাজ়াখিস্তানে যাচ্ছেন পরের মাসে। তারপরে গুজরাতে ন্যাশনাল গেমস, টিম ওয়র্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ। ঘরোয়া আর আন্তর্জাতিক মিলিয়ে একগুচ্ছ টুর্নামেন্টে ঠাসা তাঁর এবছরের ক্যালেন্ডার। এসবের দিকেই মুখিয়ে রয়েছেন চব্বিশ বছরের এই তরুণী।

ছবি: আর্কাইভ


শরৎ কমলের সঙ্গে



ত্বকের ইশারা বুঝুন

ত্বকের প্রতিটা পরিবর্তনই কিছু না কিছুর ইঙ্গিত দেয়। সেসবের সমাধান চাইলে, আগে সমস্যাগুলো চিনতে হবে। ত্বকের দশটি কমন সমস্যা এবং তার 'সায়েন্টিফিক' সমাধান রইল।





কখনও খেয়াল করেছেন, হঠাৎ করে ত্বকে একগাদা সমস্যা এসে হাজির হয়েছে? বা লাইফস্টাইল, ঘুমের প্যাটার্ন অথবা ডায়েটে একটু বদল হলেই ত্বকের আচরণও বদলে গিয়েছে? নিউটনের তৃতীয় সূত্র কিন্তু এখানেও প্রযোজ্য। আমাদের প্রতিটা ক্রিয়ার সমান এবং উলটো (বিপরীত) প্রতিক্রিয়া পড়ে আমাদের ত্বকে। যেমন ঘুমের অভাব থেকে চোখ-মুখ ফুলে যেতে পারে, শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়লে তা ত্বকের মসৃণতায় প্রভাব ফেলতে পারে। আবার, হঠাৎ অ্যাকনের সমস্যা বেড়ে গেলে তা হরমোনাল ইমব্যালান্সের দিকে নির্দেশ করতে পারে। এর সমাধান হিসেবে দোকানে অসংখ্য প্রডাক্টের অপশন রয়েছে ঠিকই, তবে সমস্যার মূলে না পৌঁছলে তো কোনওকিছুরই চিরস্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়! তাই শুধু বাহ্যিক যত্নেই সীমিত থাকা যথেষ্ট নয়। আগে সমস্যা চিনতে হবে, তারপর শুরু হবে যত্ন। কোন সমস্যার নেপথ্যে সম্ভাব্য কী কারণ থাকতে পারে, তা জেনে নিন।

১. অ্যাকনের বাড়াবাড়ি = হরমোনের গোলযোগ

এক্ষেত্রে বয়সটাও অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কারণ টিনএজের অ্যাকনের সঙ্গে তিরিশোর্ধ্বদের অ্যাকনের তফাত রয়েছে। বয়ঃসন্ধির অ্যাকনে ত্বকে তেল জমেও হতে পারে। তবে তিরিশ পেরলে অ্যাকনের মূল কারণ হতে পারে হরমোনাল পরিবর্তন। অ্যাকনে হরমোনাল কিনা, তা বোঝার আর-একটা উপায় হল, ত্বকের লালচেভাব লক্ষ করা। হরমোনাল অ্যাকনেতে সাধারণত ইনফ্ল্যামেশনও বেশি হয়। এই ধরনের অ্যাকনে সারানোর প্রধান উপায় ত্বককে শান্ত করা। এমন উপাদান ব্যবহার করুন, যা ত্বককে ইরিটেট করবে না। বেনজোইল পারঅক্সাইড হরমোনাল অ্যাকনের পক্ষে ভাল। সেনসিটিভ ত্বকে সালফার বা উইলো বার্কের মতো উপাদানে ভাল ফল দেবে।

২. প্রিম্যাচিওর এজিং না সেল টার্নওভারে সমস্যা?

প্রত্যেকের ত্বকের প্রকৃতি এবং ধরন আলাদা

হয়। ফলে সকলের যে একই সময়ে বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করবে, তা নয়। তবে তিরিশের শুরুর দিকে বা তার আগেই যদি বলিরেখা, ফাইন লাইনস ফুটে উঠতে শুরু করে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার ত্বকের সেল রিনিউয়ালের গতি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে ত্বকের কোলাজেন-বুস্ট প্রয়োজন। রেটিনল ব্যবহার করতে পারেন। এএইচএ



বা আলফা-হাইড্রক্সি অ্যাসিডেও ভাল ফল পাবেন। ৫% কনসেনট্রেশনের ল্যাকটিক অ্যাসিড বা গ্লাইকলিক অ্যাসিড এএইচএ-এর মধ্যে প্রথম সারিতে পড়ে। নিয়মিত ব্যবহার করার জন্যও উপযুক্ত। অবশ্যই এর সঙ্গে সানস্ক্রিন (এসপিএফ ৪০ বা তার বেশি) ব্যবহার করাও জরুরি।

৩. লালচেভাব বাড়লে ত্বককে বাড়তি সুরক্ষা দিন

অ্যাকনে নেই, অন্য কোনও সমস্যাও নেই। তবে গালে, থুতনিতে লালচেভাব হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। ব্লাশের খরচ কমে গেল ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন না ভুলেও! সম্ভবত, ত্বকের বাইরের স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা থেকেই লালচেভাব বেড়েছে। এর সমাধান চাইলে ক্ষতিগ্রস্ত স্তরের রিবিল্ডিং প্রয়োজন। বেসিক ক্লেনজ়িং-টোনিং-ময়শ্চারাইজ়িং রুটিন অবশ্যই ফলো করুন। তার পাশাপাশি নায়াসিনামাইড রয়েছে, এমন কোনও সেরাম ব্যবহার করুন। এতে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকবে। তবুও সমস্যা না কমলে ‘কুইক ফিক্স’ হিসেবে সবুজ কালার কারেক্টর ব্যবহার করতে পারেন।



চোখের ফোলাভাব কমাতে ডায়েটের প্রতি নজর দিন। সঙ্গে কুলিং আইক্রিম ব্যবহার করুন। অনেক আইক্রিমে এখন মেটাল-টিপ দেওয়া থাকে, যা বাড়তি কুলিং এফেক্ট দেয়। এগুলো ডি-পাফার হিসেবেও কাজ করবে।



৪. পাফি আইজ়? ডায়েটের প্রতি নজর দিন

অ্যালার্জি, ধূমপান, এমনকী অতিরিক্ত নুন খাওয়ার প্রবণতাও পাফি আইজ়ের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। আবার ঘুমের সমস্যা থেকেও চোখের ফোলাভাব বাড়তে পারে। যদি নিয়মিত সাত থেকে ন'ঘণ্টা ঘুমতে পারেন, তাহলে ডায়েটারি পরিবর্তনই সম্ভবত সমস্যার কারণ। অবশ্যই খাবারের সোডিয়াম কনটেন্টের প্রতি নজর দিন এবং পাশাপাশি টাটকা ফল, সবজি এবং পরিমাণমতো জল খান। সেই সঙ্গে কুলিং আইক্রিম ব্যবহার করুন। অনেক আইক্রিমে এখন মেটাল-টিপ দেওয়া থাকে, যা বাড়তি কুলিং এফেক্ট দেয়। এগুলো ডি-পাফার হিসেবেও কাজ করবে।

৫. ত্বকের রুক্ষতা বাড়লে বেশি করে জল খান

শুষ্ক ত্বকের কথা বলছি না কিন্তু। ত্বকের ধরন কারওর পক্ষে বদলানো সম্ভব নয়। একমাত্র আবহাওয়া এবং আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই তাতে প্রভাব ফেলতে পারে। তবে হঠাৎ যদি ত্বকের মসৃণতা কমে যেতে দেখেন, বা ত্বক নির্জীব, খসখসে মনে হয়, তার নেপথ্যে জলের অভাবের ভূমিকা থাকতেই পারে। অনেকের ক্ষেত্রে গোড়ালি ফাটতে শুরু করে প্রথমে। আগে যদি কখনও এই সমস্যা না লক্ষ করেন, তাহলে বেশি করে জল খান। পাশাপাশি





রোজ়েশিয়ার মতো সমস্যায় ত্বকের সেনসিটিভিটি আরও বেড়ে যায়। তাই প্রসাধনীতে কোনও সুগন্ধি থাকলে, তা এড়িয়ে চলুন।

হায়ালুরনিক অ্যাসিডযুক্ত ময়শ্চারাইজ়ার বা লোশন ব্যবহার করুন।

৬. স্পষ্ট ব্লাড ভেসেলস-এর অর্থ রোজ়েশিয়া নয় তো?

রোজ়েসিয়া হলে ত্বকের লালচেভাব বাড়ে, ত্বক রুক্ষ দেখায়, এসব উপসর্গ অনেকেই জানেন। কিন্তু ত্বকে যদি হঠাৎ করে ব্লাড ভেসেলস পরিষ্কার হয়ে উঠতে দেখেন, তার অর্থও রোজ়েশিয়া হতে পারে, তা কি জানেন? কপালে, গালে, থুতনিতে বা নাকের চারপাশে এধরনের সমস্যা হলে ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শ নিন। রোজ়েশিয়া কিনা সেটা বুঝতে হবে। কারণ ক্রনিক রোজ়েশিয়া সারাতে মেডিকেটেড ক্রিম, ফেসওয়াশ প্রয়োজন। পাশাপাশি সান এক্সপোজ়ার কমাতে হবে। প্রসাধনীতে কোনওরকম সুগন্ধি থাকা চলবে না এবং একগাদা প্রডাক্ট ব্যবহার করাও বন্ধ করতে হবে।



৭. ডার্ক সার্কল মানেই ঘুমের ঘাটতি নয়

ঘুমের অভাব থেকে ডার্ক সার্কল হতে পারে বা কারওর আগে থেকেই এই সমস্যা থাকলে, তা বাড়তেও পারে। তবে সবার ক্ষেত্রে যে ডার্ক সার্কলের নেপথ্যে ঘুমের অভাবই রয়েছে, তা নয়। এর নেপথ্যে জেনেটিকসেরও ভূমিকা থাকতে পারে। যদিও তা কারও নিয়ন্ত্রণে নেই বলে হয়তো চিরস্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়, তবে সমস্যা কমানোর চেষ্টা করা যেতেই পারে। ভিটামিন সি বা ই রয়েছে এমন 'ব্রাইটেনিং' আন্ডারআই ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। যদি ডার্ক সার্কল দেখতে কালচে-নীল হয়, তাহলে ব্লাড ভেসেলের ফুটে ওঠার জন্যও ডার্ক সার্কল আরও স্পষ্ট দেখাতে পারে। এক্ষেত্রে ক্যাফেনযুক্ত আইক্রিমে উপকার পাবেন।

৮. পুরনো সান ড্যামেজের সাক্ষী হতে পারে ডার্ক স্পটস

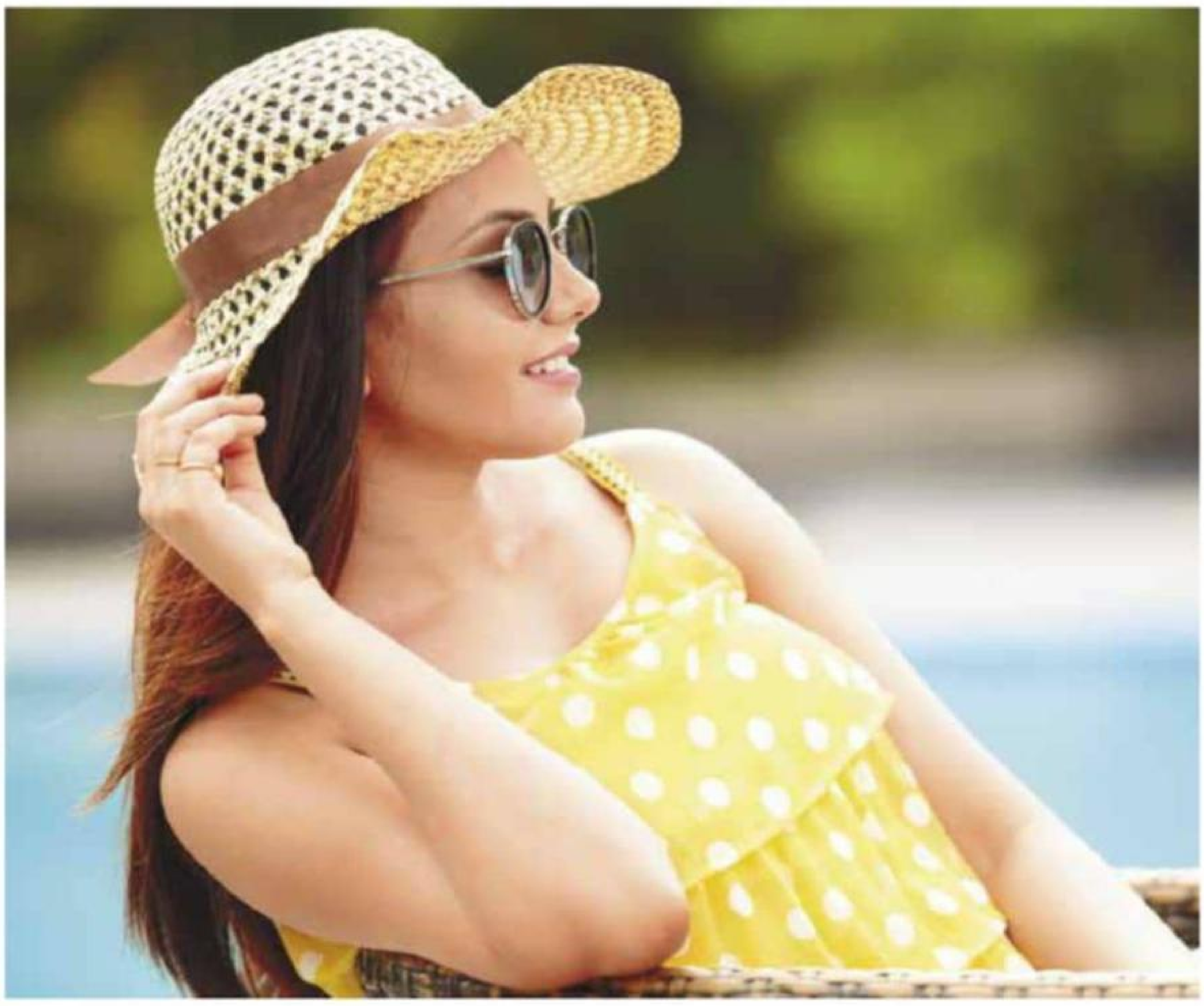
ডার্ক স্পটস বয়সজনিত কারণে হতে পারে ঠিকই, তবে অনেক পুরনো সান ড্যামেজ থেকেই নতুন দাগ দেখা দিতে পারে ত্বকে। সেই কারণেই সানস্ক্রিন ব্যবহার করার উপর এত জোর দেওয়া হয়। তবে যদি ডার্ক স্পটস ইতিমধ্যে ত্বকে এসে গিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সমাধানস্বরূপ হাইড্রোকুইনোন ক্রিম লাগাতে



ত্বকে বয়সের ছাপ পড়া আটকাতে পেপটাইড যুক্ত ক্রিম ব্যবহার করুন।



ত্বক ভাল রাখতে নিয়মিত ক্লেনজ়িং-টোনিং-ময়শ্চারইজ়িং করুন।





ডার্ক সার্কলের সমস্যায় কাজে আসতে পারে ভিটামিন সি ও ই-এর মতো উপাদান।

পারেন। এটি ত্বকের মেলানিন তৈরির জন্য আবশ্যক এনজ়াইম, টাইরোসিনেজ়ের প্রডাকশন বন্ধ করে দেয়। ফলে দাগছোপ মিলিয়ে যায়। বলে রাখা ভাল, হাইড্রোকুইনোন কিন্তু কোনও সাধারণ উপকরণ নয়। এর থেকে ত্বকের ইরিটেশন বা রোজ়েশিয়ার মতো সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। তাই ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করতে যাবেন না ভুলেও। এই ধরনের সমস্যা থাকলে হাইড্রোকুইনোনের বিকল্প হিসেবে লিকোরিস এক্সট্র্যাক্ট বা অ্যাজ়েলেয়িক অ্যাসিড কিংবা নায়াসিনামাইড ব্যবহার করতে পারেন। এগুলিও ত্বক উজ্জ্বল করে দাগছোপের উপস্থিতি কমাবে।

৯. বলিরেখার বাড়বাড়ন্ত দুর্বল ত্বকের চিহ্ন

হ্যাঁ, বয়স হলে ত্বকের ইলাস্টিসিটি কমলে বলিরেখা দেখা দেয় যেমন, তেমনই ত্বক অন্য কোনও কারণে দুর্বল হয়ে পড়লেও বলিরেখা বাড়তে পারে। এই কারণগুলোর মধ্যে দূষণ, ডিজিট্যাল এজিং, সবই পড়ে। প্রিম্যাচিওর এজিং সাইনস প্রতিরোধ করতে যেমন কোলাজেন-বুস্ট প্রয়োজন, তেমনই এই ধরনের বলিরেখা কমাতেও কোলাজেনের ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে পেপটাইডস ব্যবহার করতে পারেন। পেপটাইডস ত্বকের গ্রোথ ফ্যাক্টরের কার্যকারিতা বাড়াতে অব্যর্থ। ফলে তা ত্বককে বাড়তি সুরক্ষা



দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়া আটকাবে।





১০. স্কিন স্যাগিংয়ের সমাধান কোলাজেন নয়

ত্বকের দৃঢ়তা কমছে বলে কোলাজেন ব্যবহার করছেন। কিন্তু তারও যে একটা ক্ষমতা রয়েছে, সেটাও মনে রাখুন। টপিক্যাল কোলাজেন, অর্থাৎ কোলাজেনযুক্ত ক্রিম বা সেরামে একটা বয়স অবধি ফল পাবেন। ত্বকের বয়স রুখে দাঁড়ানোর চিরস্থায়ী সমাধান তা নয়। শুধু কোলাজেন কেন, কোনও কিছুই ত্বককে চিরতরুণ রাখতে পারে না। তার প্রয়োজনও নেই। বয়স হলে ত্বক বদলাবে, সেটা মেনে নিন। আজকাল প্রচুর ক্লিনিক্যাল ট্রিটমেন্টের অপশন রয়েছে, যা ত্বকে দৃঢ়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সেরকম কিছু ব্যবহার করতেই পারেন চাইলে। তবে সেটাও চিরস্থায়ী সমাধান নয়। বারবার করে যেতে হবে।

এখন থেকে তাহলে ত্বকের এরকম কোনও সমস্যা হলে কী করবেন, মনে থাকবে তো?



শাড়িতে বাংলার বুনন

বাংলার তাঁতির হাতের বুননে কটন, লিনেন, সিল্ক বিভিন্ন রকম শাড়িকে তিনি তুলে ধরেছেন বিশ্বের দরবারে। ফ্যাশন ডিজ়াইনার সৌমিত্র মণ্ডলের লিনেন ও সিল্ক শাড়ির এক্সক্লুসিভ কালেকশন নিয়ে রইল বিশেষ প্রতিবেদন।



(বাঁদিকের পাতা)
সিঁদুর লাল সিল্ক জ়রি
হ্যান্ডওভন জ়াকাট শাড়ি।

অলওভার মেটালিক
সিল্ক জ়রির শাড়ি।
সঙ্গে সবুজ ব্লাউজ়।
সবমিলিয়ে এক উজ্জ্বল
মেটালিক লুক।



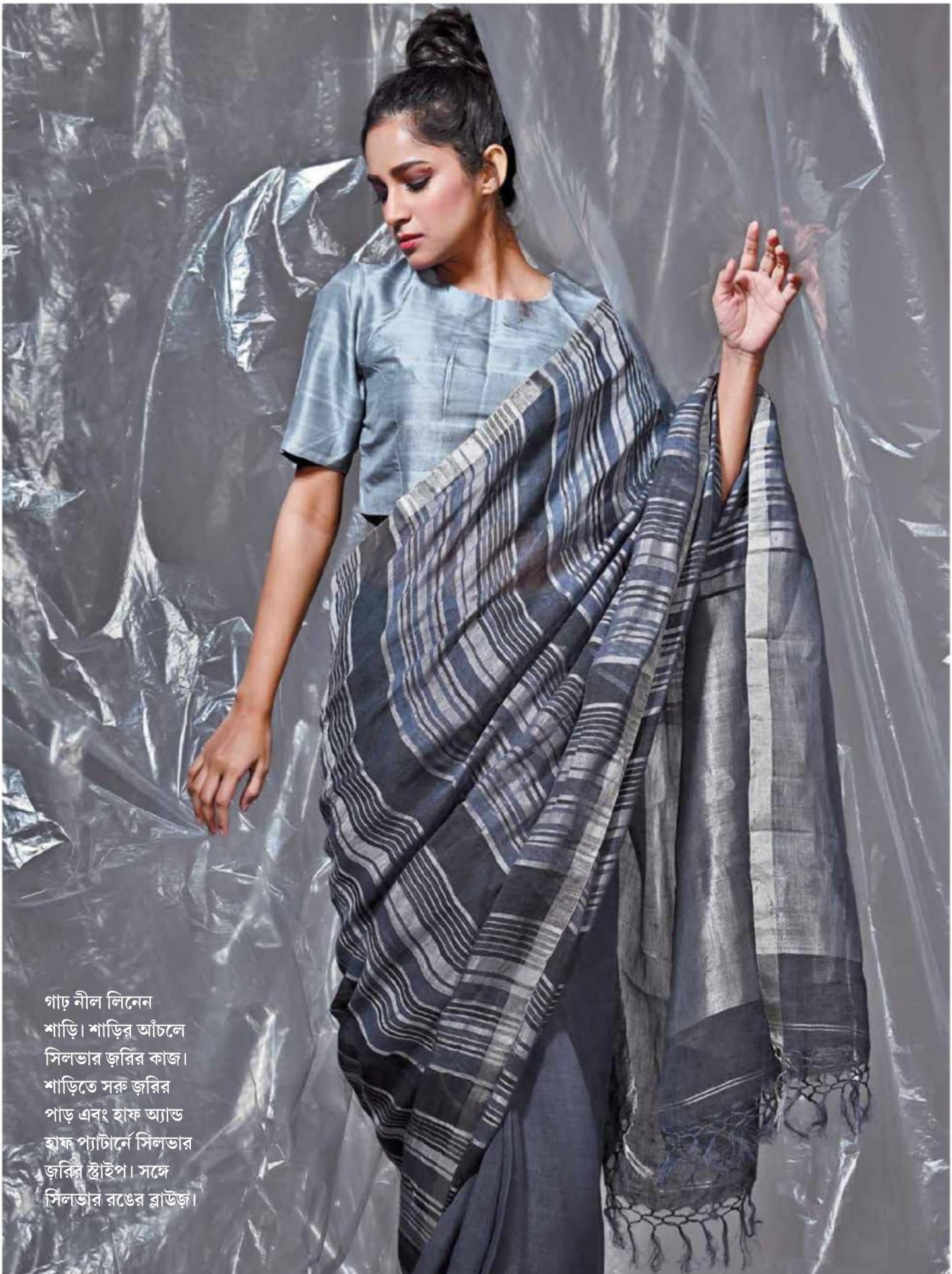
বাংলার তাঁতির বুননে
চিরন্তন লিনেন শাড়ি।
বেজ কালার লিনেন
শাড়িতে সিলভার
জ়রির বুনন।



নীল জ়াকাট শাড়ি। এই শাড়ির বিশেষত্ব হল, শাড়ি জুড়ে সিল্ক জ়রির বুনন। শাড়ির জমিতে জ়রির বুটি ওয়র্ক ও আঁচলে ভরাট জ়রির কাজে এলিগ্যান্ট লুক।



সিলভার লিনেন
অন লিনেন শাড়িতে
এলিগ্যান্ট লুক।



গাঢ় নীল লিনেন শাড়ি। শাড়ির আঁচলে সিলভার জ়রির কাজ। শাড়িতে সরু জ়রির পাড় এবং হাফ অ্যান্ড হাফ প্যাটার্নে সিলভার জ়রির স্ট্রাইপ। সঙ্গে সিলভার রঙের ব্লাউজ়।



হালকা হলুদ
লিনেন শাড়ি।
পাড় ও আঁচলে
সিলভার জ়রি
ওয়র্ক। সঙ্গে
কনট্রাস্ট কালার
ব্লাউজ়।

মডেল: দময়ন্তী, রিয়া,
শ্রীময়ী, কোয়েল
মেক-আপ: বাবুসোনা সাহা
ফোন: ৮২৪০৫৫০৮৮৪
হেয়ার: অঙ্কিতা দত্ত
স্টাইলিং: অয়ন হোড়
ফোন: ৯০০৭২২০৪৯৬
ছবি: সোমনাথ রায়



চটজলদি ওজন কমাতে ক্র্যাশ ডায়েট কিংবা ফাস্টিংয়ের ‘সহজ’ পথ বেছে নেন অনেকেই। কিন্তু এই ‘সহজ’ পথ নিরাপদ কিনা, ভেবে দেখেন না। আলোচনায় বিশিষ্ট ডায়েটিশিয়ান।



ডা. অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

নিউট্রিশনিস্ট, ফাউন্ডার-ডিরেক্টর হেলথ টোটাল (মুম্বই, পুণে, নাসিক, বেঙ্গালুরু)। ওবিসিটি ও হেলথ ডিজ়অর্ডার স্পেশ্যালিস্ট। যোগাযোগ: ১৮০০ ২৬৬ ০৬০৭/ ০২২ ৬৭২ ৬৬৮৮৮ আরও জানতে দেখুন www.health-total.com

ভুল ধারণা ভাঙুন

যাঁরা ‘ডায়েটিং’ করেন, অনেকেরই বদ্ধ ধারণা, কম কার্বোহাইড্রেট খেলে বা একেবারে বাদ দিয়ে দিলেই ওজন দ্রুতগতিতে নেমে আসবে। কার্বোহাইড্রেটের পরিবর্তে তখন ভূরি ভূরি ফ্যাট, প্রোটিন খেলেও অসুবিধে নেই, ওজন যেখানে সেখানেই থাকবে। একই কারণে আজকাল ওজন কমাতে অহরহ উপোস করে থাকছেন অনেকে। এই সব ধারণার নেপথ্যে যে বিন্দুমাত্র সত্যি নেই, বরং অনেক ক্ষতির আশঙ্কা লুকিয়ে রয়েছে, তা যদি তাঁরা বুঝতেন! চলুন, একটু ব্যাখ্যা করেই বলি। প্রথমত, সব কার্ব একরকম নয়। একথা ঠিক যে, সিম্পল কার্বোহাইড্রেট (রিফাইন্ড সুগার, ময়দা ইত্যাদি) মোটের উপর এড়িয়ে চলাই ভাল। তবে সেই সঙ্গে ডায়েটে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট (হোলগ্রেন, ফল, সবজি) রাখাও বাঞ্ছনীয়। কারণ এই খাবারগুলোই রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, সঙ্গে পেট ভরতি রাখে এবং হজমেও সাহায্য করে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ক্র্যাশ ডায়েটিংয়ের চক্করে খাবারের তালিকা থেকে কার্বোহাইড্রেট পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিলে এই কাজগুলো করতে শরীর হিমশিম খাবে। আর না পেরে মেজাজ খারাপ হবে, ঘন ঘন খিদে পাবে এবং শেষমেশ আপনি বেশি খাবার খেতে শুরু করবেন। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত ক্র্যাশ ডায়েটিংয়ের কারণে শরীরের ভাইটাল অর্গ্যানও জবাব দিয়ে বসতে পারে! এতে ওজন তো কমবেই না, বরং আয়ু কমে আসার আশঙ্কা সমূহ। দ্বিতীয়ত, উপোস করা এক বিষয় আর শরীরকে অন্যায়ভাবে খাবার থেকে বঞ্চিত রাখা আর-এক। ঘন ঘন মিল স্কিপ করা, বিশেষ করে ব্রেকফাস্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ মিল না খাওয়া যে শরীরের কত বড় অপকার, তা বলে শেষ করা যাবে না। সারারাত অভুক্ত থাকার পর সকালে যথাযথভাবে উপোস না ভাঙলে (যে কারণে ‘ব্রেক’-‘ফাস্ট’ বলা হয়), রক্তশর্করা এবং ইনসুলিনের লেভেলে তারতম্য হবে। এতে শরীর মেটাবলিজ়মের হার কমিয়ে অতিরিক্ত ফ্যাট সঞ্চয় করা শুরু করবে। ফলে ওজনের পারদ নিচে নামার পরিবর্তে হুহু করে উপরে উঠবে। মনে রাখবেন, দিনের অন্যান্য যে কোনও মিলের মধ্যে এতটা ফারাক থাকে না, যতটা ডিনার আর ব্রেকফাস্টের মধ্যে থাকে। অথচ ঘুমের মধ্যে শরীর কিন্তু কম কাজ করে না। অবিরাম হার্টবিট চলে, নার্ভের সংযোগ থাকে, কোষ বিভাজিত হয়, আরও কত কী! এসবের মধ্যে শরীর অভুক্ত থাকে। সবটুকু এনার্জি আসে রক্তে থাকা গ্লুকোজ়, লিভার এবং মাসল থেকে। তাই সকালে উঠে প্রত্যেকের, বিশেষত যাঁরা সকালে শরীরচর্চা করেন, তাঁদের আরওই সতর্ক থাকা উচিত, যাতে ব্রেকফাস্ট কোনওমতেই স্কিপ না হয়। না হলে অল্পেই শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কোনও কাজেই এনার্জি পাবেন না। খুব ভারী কিছু না খেলেও চলবে। হালকা খান, তবে ব্যালান্সড ব্রেকফাস্ট করুন। হোলগ্রেন, লো-ফ্যাট প্রোটিন বা ডেয়ারি প্রডাক্ট এবং একটা ফল রাখুন। অন্যান্য মিলেও কম করে হলেও কিছু খান। পরিমিত পরিমাণে সঠিক খাবার খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণেই থাকবে।



দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে চেনা রাস্তা

ক্যামনে থাকুম

শহুরে গতিময় জীবনে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে পড়লে ফিরে যান পাহাড়ের কাছে। সব ক্লান্তি শুষে নেবে পাহাড়। উত্তরবঙ্গ ঘুরে এসে কলম ধরলেন রজত ভট্টাচার্য।

চল্লিশ-ছোঁয়া চুল্লি থেকে পালিয়ে যাওয়ার একটাই সহজ উপায়, দার্জিলিং মেল। নেমে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চেনা কুয়াশা, পাহাড়ি বাঁক আর আরামের হাঁপ ছাড়া। এবারে গন্তব্য সান্দাকফু ছাড়িয়ে ফালুটের দিকে মাইলপাঁচেক এগিয়ে তেপান্তরের মাঠে জনমানবশূন্য এক কামরা। আকাশের তারাদের ছুঁতে না-পারলেও, নিদেনপক্ষে লেন্সবন্দি করার জন্য এই স্থানের মাহাত্ম্য স্থানীয়দের কাছে সুবিদিত। মানেভঞ্জন থেকে পারমিট নিয়ে গাড়ি রওনা হতে বেশ বেলা হয়ে গেল। হঠাৎ ছুটির খুশিতে সকলের গলায় চেনা সুর, মেঘ পিওনের ব্যাগের ভেতর... কিন্তু অচিরেই মেঘ পিওনের ব্যাগের ভেতর থেকে অঝোরে শিলাবৃষ্টি, হাড়কাঁপানো ঠান্ডা আর রামঝাঁকুনি। আমরা সকলেই শ্রীকান্ত আচার্য থেকে কী অনায়াসে ভীমসেন জোশি! আমাদের তারানার তাড়নায় তেনজি় এতটা উদ্বুদ্ধ হবে কে ভেবেছিল! সে গাড়ি ছোটাল প্রাণপণ, কিন্তু অ-সুরদের থেকে মুক্তি কি এত সহজ!





রহস্যময় সৌন্দর্য

এবার অন্ধকার নেমে এল নিকষ, প্রবল বৃষ্টিতে উইন্ডস্ক্রিন হয়ে গেল ঘষা কাচ, রাস্তা হয়ে গেল পাথুরে নদীর কঙ্কাল, সকলেই আসন্ন বিপদের কথা ভেবে ঠান্ডা মেরে গেছে। এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো— বাজছে মনের কোণে। কথিত আছে পাহাড়ি ড্রাইভারের নখের যুগ্যিও আমরা নই, তা বেশ মালুম পেলাম ঠিক তেনজ়ির পাশে বসে। একচুল এদিক হওয়া মানেই যেখানে কালকের কাগজে সংক্ষিপ্ত দুঃসংবাদ, সেখানে তেনজ়ি যেন ম্যাজিশিয়ান! জাদুকরেরা যেমন চোখে কালো ফেট্টি দিয়ে নিশানা বাঁধে, অবিকল সেরকম জ়িরো ভিজ়িবিলিটিতে সে আমাদের পৌঁছে দিল গন্তব্যে। টিমটিম করছে ঘর, তিনদিকে তিনটে খাট, গোলাপফুল-ছাপ কম্বল, আর সবকিছু ছাপিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার গর্জন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা যেন আরও প্রকট আর পাশবিক আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে। এমতাবস্থায় রামনাম করা ছাড়া গতি নেই। তাই শুরু হল গল্প। শুরুতে খালি কাজের কথা, মন জুড়ে থাকা কাজের চাপের কথা, তারপর রাত বাড়তে সেই সব কথা মিলিয়ে গিয়ে বেরিয়ে এল ফেলে আসা বন্ধুদের কথা, দিনের কথা। ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা বেরোলাম খোলা আকাশের নীচে। দেশি বা ভিনদেশি কোনও তারারই দেখা নেই। কালো চাদরে ঢাকা সেই আকাশ দেখে বন্ধু বলল, ‘‘কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কেটে গেল— কেউ কথা রাখে না।’’ ভোরবেলা পর্দা সরিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার কথা ছিল। কিন্তু এ তো তোলা উনুন থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার মতো ঘন কুয়াশা! ঘোর বৈশাখে মন খারাপের চৈত্র সেল দিয়ে শুরু স্যাঁতস্যাঁতে সকাল। কিছুক্ষণ বাদেই টিপটিপ, তারপর ঝমঝম। চাষার মনে তখনও অদূর ভবিষ্যতের আশার আলো।

সেটা পুরোপুরি নিভিয়ে দিতে এবারে শুরু হল শিলাবৃষ্টি। জানলার সার্সি দিয়ে সেই শিল গড়িয়ে নীচের দিকে বরফ হয়ে জমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেদিনের সব পরিকল্পনার ঘনীভূত সলিল সমাধি।







সকালে দেখেছিলাম ৮ ডিগ্রি। তা নামতে নামতে এখন ৫-এর নীচে। আমরা ঘুরে ফিরে বারবার দেখে চলেছি আর কত নীচে নামতে পারে তাপমাত্রা, আমাদের সব আশায় জল ঢেলে। এখানে শুধু কিছু প্রাগৈতিহাসিক জিপ চলে। তাদেরই একটি এসে দাঁড়াল। কিছু যাত্রী এখানে এসে আজ দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে রওনা হবে ফালুট-এর দিকে, তার প্রস্তুতি করতে। আমাদের নিস্তরঙ্গ আটকে পড়া দিনে আপাতত এটুকুই স্বাদবদল। রান্নাঘরে কর্মকাণ্ড চলছে— তার আওয়াজ, বৃষ্টির অবিরাম আওয়াজ আর নিজেদের কাছে মেনে নেওয়া যে আমরা আটকা পড়েছি, নিজেদের কর্মব্যস্ত জীবন থেকে পালাতে পালাতে এক নির্জন প্রান্তে। ভাগ্যিস এখানে কোনও আয়না নেই। এমন সময়, ভেজা কনকনে দুপুরে, অনিল জিজ্ঞেস করল কী খাব। এটা কোনও প্রশ্ন হল? আমরা সমস্বরে বললাম, ‘‘খিচুড়ি, ডিমভাজা আর পাঁপড়!’’

সেই ধোঁয়া-ওঠা খিচুড়ির স্বাদ, জীবনের অল্প কিছু অবিস্মরণীয় প্রিয় ‘এলিট’ স্বাদের সঙ্গে একাসনে বসে পড়ল কী অনায়াসে! আর অমিতাভ-রেখা, উত্তম-সুচিত্রার মতোই খিচুড়ির হাত ধরে ভাতঘুম আমাদের টেনে নিল ত্রিস্তরীয় কম্বলের নীচে, অনিবার্য পরিণতির দিকে। ঘুম যখন ভাঙল, তখন শুনলাম পয়েন্ট সাত ডিগ্রি গরম পড়েছে, থার্মোমিটার বলছে ৫.৬ আর ঘড়ি বলছে ৬.০৫।



নৈঃশব্দ্য যেখানে কথা বলে



রুক্ষতার মাঝে রঙের ঝলক

একটু বাদে আগুন জ্বেলে তাপ নেওয়া শুরু হল। এখনও মেঘ আর কুয়াশা, বৃষ্টি থেমেছে একটু আগে। কল দিয়ে জল পড়ার অবিরাম শব্দ আর নীরবে গ্লাভস খুলে হাত আগুনে সেঁকা চলছে তো চলছেই। সময় থেমে গেছে। শুধু তিনজন আগুনের অল্প আভায়... কী ভাবছে, নাকি আর কিছুই ভাবছে না— মেনে নিতে চাইছে যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে। হঠাৎ টর্চের তেরছা আলো এসে পড়ায় যেন চটক ভাঙল।

কে? এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এই অন্ধকারে কে? ফরেস্ট অফিসার সাহেব এসে দেখে গেলেন, আমরা কে কোথা থেকে এসেছি। কথায় কথায় জানালেন, পাঁচ বছর ধরে এই তল্লাটে ডিউটি করছেন। কিন্তু রেড পান্ডা দেখেছেন মাত্র একবার। তাই আমাদের দু'রাত থেকে বেশি আশা করা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। উনি চলে গেলে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম— ফ্যামিলি ছেড়ে এই বছর পঁয়ত্রিশের তরুণ পাঁচ বছর ধরে এই ধূ ধূ প্রান্তরে পড়ে রয়েছেন, সেখানে আমরা এক দিনের খারাপ আবহাওয়ায় কাতর হয়ে পড়ব? কভি নেহি!

যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে তবু আমরা যে যার মতো করে আগামিকালের নতুন ঝকঝকে ভোরের স্বপ্ন দেখলাম। যে রকম আমরা রোজকার কুয়াশা-দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে স্বীকার করেও প্রতিদিন আরও ভাল আগামীর কথা ভেবে শুতে যাই, তার চেয়ে দু'ডিগ্রি বেশি বেপরোয়া হয়ে... চাকা ঘুরবেই এরকম একটা আবছা বোধ নিয়ে। ভগবান যে আমাদের উপর এই অবিচার আর মেনে নেবেন না এবং সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ ধরে আমাদের আপ্লুত হওয়ার সুযোগ দেবেন, এই ব্যাপারে সহমত হয়ে আমরা ঘরে ঢুকলাম। দেখেছেন কী ভুলো মন! থার্মোমিটার তো বাইরে রেখে এসেছিলাম। কী আশ্চর্য! সারাদিনের অনেক ওঠানামার পর থার্মোমিটার বলছে ৪.৯ ডিগ্রি। আপনাদের আগেই বলেছিলাম না? মেলাবেন তিনি মেলাবেন!

একজোড়া কন্দর্পকান্তি ফরাসি ছেলে-মেয়ে এসেছে সান্দাকফু ট্রেক করতে। সকলেই তাদের সঙ্গে ভাব জমাতে চায়। টংলুতে ট্রেকার্স হাটের ডাইনিং হলে আধো অন্ধকারে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তারা ভূগোল শিখছে। আমরা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে, ওয়েস্ট বেঙ্গল আসলে একটা রাজ্য। ইস্ট বেঙ্গলও আছে, তবে সেটা একটা দেশ। যাকে বাংলাদেশ বলে। আমি যদিও নর্থ বেঙ্গলের ছেলে, আর আমার বন্ধু সাউথ বেঙ্গল

থেকে এসেছে— আর আসলে নর্থ বেঙ্গল, সাউথ বেঙ্গল দুটোই ওয়েস্ট বেঙ্গলের অন্তর্গত। ফরাসি মাথা চুলকোয়। যদিও আমরা নর্থ বেঙ্গলে, কিন্তু আসলে নাকি এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল! ফরাসিনী কম্পাস বের করে, কিছু না-বুঝতে পারার লজ্জায় আধো লাল এবং হতভম্ব! মনস্থির করতে পারে না, ওটা ছুড়ে ফেলে দেওয়াই ঠিক কিনা। তাদের বোঝানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা চলতেই থাকে, এই রুটে আপনার বাঁ পা ইন্ডিয়ায়, থুড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলে, থুড়ি নর্থ বেঙ্গলে— তো ডান পা নেপালে। নেপাল কিন্তু রাজ্য নয়, ওটা আবার আর একটা দেশ। আমরা পাশের টেবলে বসে চট করে টেবলের তলায় নিজেদের বাঁ পা ডান পা দেখে নিই!

চল্লিশোর্ধ জনাদশেকের গ্রুপ এসেছে, তাদের প্রবল উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে পুরো এলাকা জুড়ে। ভোরবেলা তাদেরই একজন আমাকে বললেন, ‘‘খুব মিস করে গেলেন আপনারা, আগেরবার আমরা পরিষ্কার আকাশ পেয়েছিলাম এখান থেকে আর দেখেছিলাম সাতরঙা মেঘ।’’ তাঁর টলমলে পা আর চোখের চাহনি অবশ্য বলছে, সাতরঙা মেঘ উনি ঘরে বসেও দেখতে পারতেন, এতটা কষ্ট করে না এলেও হত! তবু এই বলার মধ্যে একটা তৃপ্তি আছে, আপনি পাননি আমি পেয়েছি, আমি দেখেছি।

অনেক না-পাওয়ার মধ্যে এইটুকু তৃপ্তি ওঁর জন্য তোলা থাক। আমি ওঁকে কথার আরাম দিলাম। বললাম, ‘‘লাকি ইউ!’’

উনি খুব খুশি হলেন। মানুষ মাঝে মাঝে কী



প্রকৃতির ক্যানভাস

অল্পেই খুশি হতে পারে!

বেড়ালটা এই ঠান্ডায় গা ঘেঁষে বসছে সকলের। ওর নাম মধুবন্তী। যাদবপুর ইংলিশ অনার্স কিনা জিজ্ঞেস করায় কোনও পাত্তা না দিয়ে উল্টোদিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকল। ট্রেকার্স হাট যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁরা কী পরিশ্রমটাই না করে চলেছেন! কিন্তু মুখে সেই অমলিন পাহাড়ি হাসি। ঢোকার মুখেই তাকে তাকে সাজানো উজ্জ্বল পাহাড়ি ফুল। তাই সাধারণ ঝুপড়িও যেন খুশিতে মাতোয়ারা।

এখানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অনেক ধরনের লোক। তাদের কেউই এত কষ্ট করে এসেও দেখতে পায়নি কাঞ্চনজঙ্ঘার মোহময়ী রূপ। একরাতের স্বল্প সময়ে দেখে ফেলতে পারেনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। মানুষ মাঝে মাঝে কী অল্পেই দুঃখী হতে পারে!

ফরাসি ছেলেটি উঠে আড়মোড়া ভাঙল, মধুবন্তী কিছু একটা বলল ফরাসিতে। আমরা তিনজন অদূরে বসে— বোঝার চেষ্টা ছাড়িনি। এগুলো শুধুমাত্র সঙ্কেত যা বোঝার জন্য আপনাকে আসতেই হবে এখানে।

এই উপত্যকায় চার দিকে শুধু বাজ পড়ে ঝলসে



নীল নির্জনে...



পাহাড় যখন বন্ধু



চলার পথে হঠাৎ দেখা



পুড়ে যাওয়া কালচে রুপোলি ভাঙা গাছ। তারাই পাহারা দেয় মেঘেদের। অল্পবয়সি অচেনা অজানা মেঘেরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে, ঝোড়ো হাওয়ার মাঝেও। চোখে চোখে কথা— এই ছেলেটা ভেলভেলেটা। কথা বলব কী, বলতে গেলেই খালি ধোঁয়া! এই রূপান্তর দেখে মেঘ ফিক করে হাসে! কালচে ভাঙা গাছের চোখ এড়ায় না, সটান ডাল মেলে বলে, আসকারা দিসনি আর। ছাই রঙের দিগন্ত, টানা বুনো আওয়াজ করে চলা হাওয়া আর তার ভিতরে এক-একজন মেঘ এসে হাত ছুঁয়ে ছুটে পালাচ্ছে— এই ছেলেটা ভেলভেলেটা! কিছুই দেখা যাচ্ছে না আর, শুধু নিজের দুটো হাত। চারপাশে খালি ছটফটে মেঘেদের ফিসফিস। হাতড়ে হাতড়ে আস্তানায় ফেরার চেষ্টা করছি, পিছল বরফমাটি থেকে ধোঁয়া উঠছে। মেঘেদের কি এখন স্কুল ছুটি হল? খিলখিল হাসি, পারবে না... বাড়ি আমরা যেতে দেব না... কত শখ... দাঁড়া বাড়িতে বলে দেব!

কিছুটা দূরে গিয়ে আস্তানা দেখতে পেয়ে খুব মন খারাপ হল। কী এমন ক্ষতি হত যদি মেঘ কুয়াশার দেশে এসে আমিও মেঘ হয়ে যেতাম? মাথায় বাজকে ছুঁলাম। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছি, তবু কেন মাটি আঁকড়ে পড়ে আছি জানিস? এই মেঘগুলো বড্ড দুরন্ত, বাপ-মা নেই... আমরাই তাই একটু বকাঝকা দিয়ে, পাহারা দিয়ে রাখি। না হলে কবে খাদে তলিয়ে যেত! মাথায় বাজকে আমি জিজ্ঞেস করি, ‘‘পারবে আমাকে একটু বকাঝকা করতে? কতদিন হয়ে গেল, আমাকে কেউ বকে না!’’ মেঘেরা হুড়োহুড়ি করে ওঠে। কালো ডাল কেঁপে ওঠে এ কথা শুনে। অদূরেই তোড়ে বৃষ্টি নামে, তার ছাঁট এসে লাগে মেঘ হতে চাওয়া শহুরে মানুষের গালে, চোখে... আর ঠিক এই সময় দিবানিদ্রা ভেঙে যায়। সার্সি ঠিকমতো বন্ধ ছিল না। এখন সার্সির ওপারে ঝলসে পুড়ে যাওয়া কালচে রুপোলি ভাঙা গাছ, এ পারে ঝলসে পুড়ে যাওয়া মানুষ। আর তাদের দু’জনের বুক জুড়ে অল্পবয়সি অচেনা অজানা মেঘের দল।

ছবি: লেখক